সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন • মে-জুন ২০২২

শিক্ষালোক

কোনো গাঁয়ে কোনো ঘর কেউ রবে না নিরক্ষর

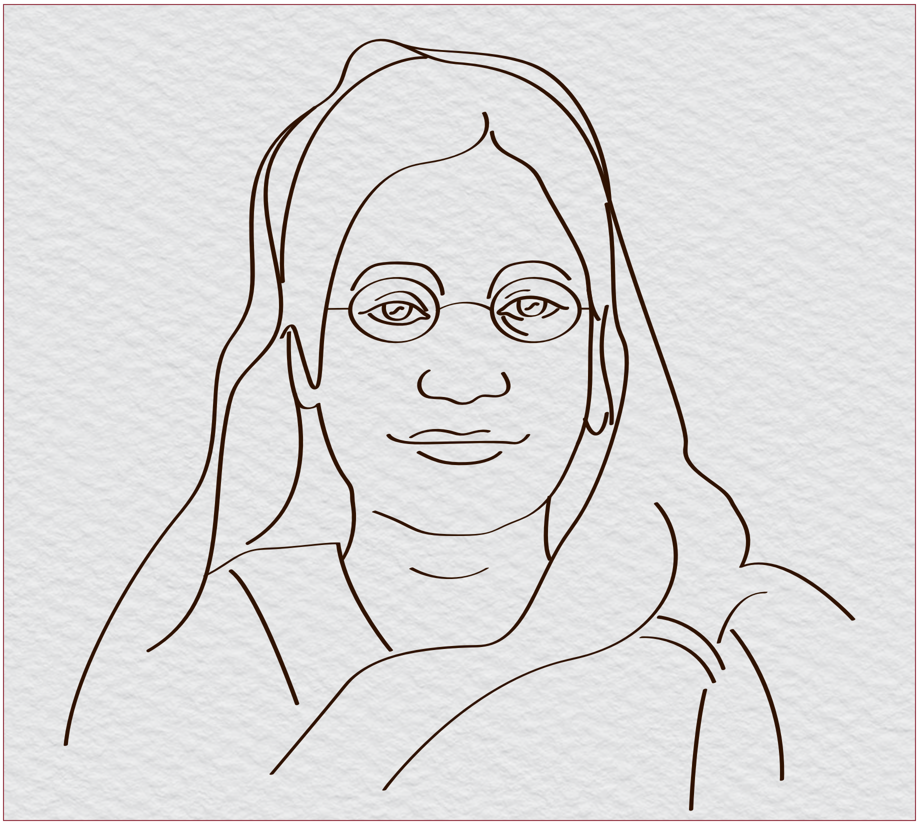

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ - ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২

৪র্থ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
সিদীপ-এর শিক্ষা বিষয়ক বুলেটিন
ইমেইল: shikkhalokcdip@gmail.com, ফেসবুক: শিক্ষালোক বুলেটিন

শিক্ষালোক

মে - জুন ২০২২ ● ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

সূচি

বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' ২
সজনা ও তালগাছ চাষ - কৃষিবিদ ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা ৫
গ্রামেগঞ্জে গজিয়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান - কাজী বজলুর রহমান ৮
বিজ্ঞানের দিকপাল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু - অলোক আচার্য ১০
একজন তরুণ বিজ্ঞানীর অকাল প্রয়াণ - আলমগীর খান ১১
মানবিক বিশ্বের জন্য সমাজকর্ম ১৪
কাঁচির কারখানা - মনজুর শামস ও মো. শাহজাহান মিয়া ১৬
পাবনা পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতি বিষয়ক সেমিনার - আব্দুল জব্বার ১৭
কবিতা ১৮
'কৈশোর কর্মসূচি' নিয়ে কিছু কথা - মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম ১৯
টংগিবাড়ীতে আয়োজিত শিশু মেলা - মো. আব্দুস সামাদ ২০
৪র্থ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন ২১
গ্রাম পর্যায়ে 'মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার' গঠন ২২
আপন আলোয় রাঙানো ক্যানভাস - শিশির মল্লিক ২৩
শ্রদ্ধাঞ্জলি : অধ্যাপক বেনেডিক্ট গোমেজ - আশরাফ আহমেদ ২৭

প্রধান সম্পাদক
মিফতা নাঈম হুদা

সম্পাদক
ফজলুল বারি

নির্বাহী সম্পাদক
আলমগীর খান

ডিজাইন ও মুদ্রণ
আইআরসি irc.com.bd

সম্পাদকীয়

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলার সমাজজীবনে ও সাহিত্যভুবনে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। বাংলায় নারীমুক্তি আন্দোলনের তিনি দৃষ্টান্তস্থাপনকারী পথপ্রদর্শক। সারা বাংলায় মানুষের মাঝে তিনি বেগম রোকেয়া নামে সুপরিচিত। তবে তার জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পাঠ ও চর্চা আশানুরূপ নয়। অথচ বাংলায় নারীমুক্তিকে সফল করতে হলে অনেক বেশি রোকেয়া পাঠ ও চর্চার বিকল্প নেই।

আমরা যারা গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিকসেবাসহ বিভিন্ন রকম উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম করে থাকি তারা নারীমুক্তিকে উন্নয়নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মনে করি। অথচ কাজটি কঠিন। তবু সরকারসহ উন্নয়ন সংস্থা ও অন্যান্যের নানামুখী ভূমিকার ফলে আমাদের দেশে নারীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু পথ অনেক দীর্ঘ এবং করণীয় আরও অনেক কিছু। এবার শিক্ষালোকে আমরা তাই বেগম রোকেয়ার লেখা 'সুলতানার স্বপ্ন' উপন্যাসটির অংশবিশেষ প্রকাশ করছি। আমরা চাই সারাদেশে রোকেয়া পাঠ ও চর্চা বাড়ুক।

এবারের শিক্ষালোকে অধ্যাপক বেনেডিক্ট গোমেজকে নিয়ে আশরাফ আহমেদের স্মৃতিচারণমূলক লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ যখন আমাদের সমাজে শিক্ষকদেরকে অবমাননা ভাইরাসের মত ছড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানের তিনজন নারী চিত্রশিল্পীকে নিয়ে লেখাটিও এ সংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

সিদীপের নানা কার্যক্রম, একজন নারী উদ্যোক্তার কথা, কৈশোর কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয়গুলোও ভালভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমে উৎসাহিত হয়ে এর সঙ্গে 'মুক্তপাঠাগার' স্থাপন করার বিষয়ে সিদীপ একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি সংস্থার দুটি ব্রাঞ্চের কর্ম-এলাকায় দুটি স্কুলে এ মুক্তপাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে যার মূলনীতি হচ্ছে বইয়ের তাক উন্মুক্ত থাকবে যেখান থেকে ছাত্রছাত্রী কোন তদারকি ছাড়া ইচ্ছেমত বই নিয়ে পড়তে পারে এবং সুবিধামত ফেরত দিতে পারে। এ সম্পর্কে একটি সংবাদ এ সংখ্যায় ছাপা হলো। অন্যান্য ব্রাঞ্চেও এ উদ্যোগটি ছড়িয়ে দেয়া হবে।

সব মিলিয়ে আশা করি সবারই ভাল লাগবে।

ফজলুল বারি

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)
বাসা নং-১৭, রোড নং-১৩, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি লি:, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, ফোন: ৪৮১১৮৬৩৩, ৪৮১১৮৬৩৪।
Email : info@cdipbd.org, web: www.cdipbd.org

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

সুলতানার স্বপ্ন

[বেগম রোকেয়ার লেখা Sultana's Dream ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে The Indian Ladies' Magazine-এ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২২ সালে রোকেয়া নিজেই এটি বাংলায় অনুবাদ করেন। এখানে 'সুলতানার স্বপ্ন' থেকে অংশবিশেষ পুনর্মুদ্রিত হলো। –সম্পাদক]

তাই ত, ধনধান্যপূর্ণা নারীস্থানে ম্যালেরিয়া কিম্বা প্লেগের অত্যাচার হইবে কেন? প্লীহা-স্ফীত উদর ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বাঙ্গালায় দরিদ্রদিগের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি নীরবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে তাঁহাদের রন্ধনশালা দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। অবশ্য যথাবিধি পর্দা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল! একি রন্ধন-গৃহ, না নন্দন-কানন? রন্ধনশালার চতুর্দিকে মনোরম সবজী বাগান এবং নানাপ্রকার তরিতরকারীর লতাগুল্মে পরিপূর্ণ। ঘরের ভিতর ধূম বা ইন্ধনের কোন চিহ্ন নাই,– মেজেখানি অমল ধবল মর্মর প্রস্তর-নির্মিত; মুক্ত বাতায়নগুলি সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পদামে সুসজ্জিত! আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,–

"আপনারা রাঁধেন কিরূপে? কোথাও ত অগ্নি জ্বালিবার স্থান দেখিতেছি না?"

তিনি বলিলেন, "সূর্যোত্তাপে রান্না হয়।" অতঃপর কি প্রকারে সৌরকর একটা নলের ভিতর দিয়া আইসে, সেই নলটা তিনি আমাকে দেখাইলেন। কেবল ইহাই নহে; তিনি তৎক্ষণাৎ এক পাত্র ব্যঞ্জন (যাহা পূর্ব হইতে তথায় রন্ধনের নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল) রাঁধিয়া আমাকে সেই অদ্ভুত রন্ধন প্রণালী দেখাইলেন।

আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনারা সৌরোত্তাপ সংগ্রহ করেন কি প্রকারে?"

ভগিনী বলিলেন, "কিরূপে সৌরকর আমাদের করায়ত্ত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস শুনিবেন? ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন আমাদের বর্তমান মহারাণী সিংহাসনপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিলেন। তিনি নামতঃ রাণী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যশাসন করিতেন।"

"মহারাণী বাল্যকাল হইতেই বিজ্ঞান-চর্চা করিতে ভালবাসিতেন। সাধারণ রাজকন্যাদের ন্যায় তিনি বৃথা সময় যাপন

করিতেন না। একদিন তাঁহার খেয়াল হইল যে, তাঁহার রাজ্যের সমুদয় স্ত্রীলোকই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হউক। মহারাণীর খেয়াল,– সে খেয়াল তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত হইল! অচিরে গভর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকা স্কুল স্থাপিত হইল। এমন কি পল্লীগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয়-স্রোত প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ-প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না। –এই আইন হইল। আর এক কথা, এই পরিবর্তনের পূর্বে আমরাও আপনাদের মত কঠোর অবরোধে বন্দিনী থাকিতাম।"

"এখন কিন্তু বিপরীত অবস্থা!" এই বলিয়া আমি হাসিলাম।

"কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ত সেই প্রকারই আছে! কতদিন তাঁহারা বাহিরে, আমরা ঘরে ছিলাম; এখন তাঁহারা ঘরে, আমরা বাহিরে আছি! পরিবর্তন প্রকৃতিরই নিয়ম! কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইল; তথায় বালকদের প্রবেশ নিষেধ ছিল।"

"আমাদের পৃষ্ঠপোষিকা স্বয়ং মহারাণী,–আর কি কোন অভাব থাকিতে পারে। অবলাগণ অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে বিজ্ঞান আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এই সময় রাজধানীর একতর বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা-প্রিন্সিপাল একটি অভিনব বেলুন নির্মাণ করিলেন; এই বেলুনে কতকগুলি নল সংযোগ করা হইল। বেলুনটি শূন্যে মেঘের উপর স্থাপন করা গেল,– বায়ুর আর্দ্রতা ঐ বেলুনে সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল,– এইরূপে জলধরকে ফাঁকি দিয়া তাঁহারা বৃষ্টিজল করায়ত্ত করিলেন! বিদ্যালয়ের লোকেরা সর্বদা ওই বেলুনের সাহায্যে জল গ্রহণ করিত কি না, তাই আর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হইতে পারিত না। এই অদ্ভুত উপায়ে বুদ্ধিমতী লেডী প্রিন্সিপাল প্রাকৃতিক ঝড়-বৃষ্টি নিবারণ করিলেন।"

"বটে! তাই আপনাদের এখানে পথে কর্দম দেখিলাম না।" কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না,– নলের ভিতর বায়ুর আর্দ্রতা কিরূপে আবদ্ধ থাকিতে পারে; আর ঐরূপে বায়ু হইতে জল সংগ্রহ করাই বা কিরূপে সম্ভব? তিনি আমাকে ইহা বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি! –তাহাতে আবার বিজ্ঞান রসায়নের সঙ্গে আমাদের (অর্থাৎ মোসলেম ললনাদের) কোন পুরুষে পরিচয় নাই! সুতরাং ভগিনী সারার ব্যাখ্যা কোনমতেই আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন:–

"দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই জলধর-বেলুন দর্শনে অতীব বিস্মিত হইল, –অতিহিংসায় তাহার উচ্চাকাঙ্খা সহস্রগুণ বর্ধিত হইল। প্রিন্সিপাল মনস্থ করিলেন যে, এমন কিছু অসাধারণ বস্তু সৃষ্টি করা চাই যাহাতে কাদম্বিনী-বিজয়ী বিদ্যালয়কে পরাভূত করা যায়। তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন, তদ্বারা সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করা যায়। কেবল ইহাই নহে, –তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে ঐ উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে এবং ইচ্ছামত যথা তথা বিতরণ করিতে পারেন।"

"যৎকালে এদেশের রমণীবৃন্দ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে নিযুক্ত ছিলেন, পুরুষেরা তখন সৈনিক বিভাগের বলবৃদ্ধির চেষ্টায় ছিলেন। যখন নরবীরগণ শুনিতে পাইলেন যে জেনানা বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয় বায়ু হইতে জলগ্রহণ করিতে এবং সূর্যোত্তাপ সংগ্রহ করিতে পারে, তাঁহারা তাচ্ছিল্যের ভাবে হাসিলেন। এমন কি তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্যপ্রণালীকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিতেও বিরত হন নাই।"

আমি বলিলাম, "আপনাদের কার্যকলাপ বাস্তবিক অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু এখন বলুন দেখি, আপনারা পুরুষদের কি প্রকারে অন্তঃপুরে বন্দী করিলেন? কোনরূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন না কি?"

ভগিনী বলিলেন, "না।"

"তাহারা যে নিজে ধরা দিবেন ইহাও ত সম্ভব নয়। মুক্ত স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বেচ্ছায় চতুষ্প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী হইবে কোন পাগল? তবে অবশ্যই পুরুষেরা কোনরূপে আপনাদের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিলেন।"

"হাঁ, তাই বটে!"

"কে প্রথমে পুরুষ-প্রবরদের পরাভূত করিল, –সম্ভবতঃ কতিপয় নারীযোদ্ধা?"

"না, এদেশের পুরুষ দল বাহুবলে পরাস্ত হয় নাই।"

"হাঁ, ইহা অসম্ভবও বটে, কারণ পুরুষের বাহু নারীর বাহু অপেক্ষা দুর্বল নহে। তবে?"

"মস্তিষ্ক-বলে।"

"তাহাদের মস্তিষ্কও ত রমণীর তুলনায় বৃহত্তর ও গুরুতর। না?– কি বলেন?"

"মস্তিষ্ক গুরুতর হইলেই কি? হস্তীর মস্তিষ্কও ত মানবের তুলনায় বৃহৎ এবং ভারী, তবু ত মানুষ হস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে!"

"ঠিক ত! কিন্তু কি প্রকারে কর্তারা বন্দী হইলেন, এ কথা জানিবার জন্য আমি বড় উৎসুক হইয়াছি। শীঘ্র বলুন, –আর বিলম্ব সহে না!"

"স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রকারী, এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেক ভাবে–অনেক যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনা চিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাহা হউক, দশ বৎসর পূর্বে যখন সৈনিক বিভাগের কর্মচারীগণ আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদিকে 'স্বপ্ন-কল্পনা' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, তখন কতিপয় ছাত্রী তদুত্তরে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপালদ্বয় বাধা দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তোমরা বাক্যে উত্তর না দিয়া সুযোগ পাইলে কার্য দ্বারা উত্তর দিও। ঈশ্বর কৃপায় এই উত্তর দিবার সুযোগের জন্য ছাত্রীদিগকে অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

"ভারি আশ্চর্য!" আমি অতি আনন্দে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া করতালি দিয়া বলিলাম, "এখন দাম্ভিক ভদ্রলোকেরা অন্তঃপুরে বসিয়া 'স্বপ্ন-কল্পনায়' বিভোর রহিয়াছেন।"

ভগিনী সারা বলিয়া যাইতে লাগিলেন,–

"কিছুদিন পরে কয়েকজন বিদেশী লোক এদেশে আসিয়া আশ্রয় লইল। তাহারা কোন

প্রকার রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। তাহাদের রাজা ন্যায়সঙ্গত সুশাসন বা সুবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি কেবল স্বামিত্ব ও অপ্রতিহত বিক্রম প্রকাশে তৎপর ছিলেন। তিনি আমাদের সহৃদয়া মহারাণীকে ঐ আসামী ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাণী ত দয়া-প্রতিমা জননীর জাতি–সুতরাং তিনি তাঁহার আশ্রিত হতভাগ্যদিগকে ক্রুদ্ধ রাজার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য ধরিয়া দিলেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী রাজা ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন।"

"আমাদের রণসজ্জাও প্রস্তুত ছিল, সৈন্য সেনানীগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারা বীরোচিত উৎসাহে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। তুমুল সংগ্রাম বাঁধিল–রক্ত গঙ্গায় দেশ ডুবিয়া গেল! প্রতিদিন যোদ্ধাগণ অম্লান বদনে পতঙ্গপ্রায় সমরানলে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিল।"

"কিন্তু শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। আমাদের সেনাদল প্রাণপণে কেশরীবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাৎবর্তী হইতে লাগিল, এবং শত্রুগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইল।"

"কেবল বেতনভোগী সেনা কেন, দেশের ইতর-ভদ্র–সকল লোকই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এমন কি ৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে ষোড়শবর্ষীয় বালক পর্যন্ত সমরশায়ী হইতে চলিল। কতিপয় প্রধান সেনাপতি নিহত হইলেন; অসংখ্য সেনা প্রাণ হারাইল; অবশিষ্ট যোদ্ধাগণ বিতাড়িত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য হইল। শত্রু এখন রাজধানী হইতে মাত্র ১২/১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত–আর দুই চারি দিবসের যুদ্ধের পরেই তাহারা রাজধানী আক্রমণ করিবেন।"

"এই সঙ্কট সময়ে সম্রাজ্ঞী জনকতক বুদ্ধিমতী মহিলাকে লইয়া সভা আহ্বান করিলেন। এখন কি করা কর্তব্য ইহাই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল।"

"কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, রীতিমত যুদ্ধ করিতে যাইবেন; অন্য দল বলিলেন যে, ইহা অসম্ভব– কারণ একে ত অবলারা সমরনৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার কৃপাণ, তোষাদান, বন্দুক ধারণেও অক্ষমা; তৃতীয় দল বলিলেন যে, যুদ্ধ-নৈপুণ্য দূরে থাকুক–রমণীর শারীরিক দুর্বলতাই প্রধান অন্তরায়।"

"মহারাণী বলিলেন, 'যদি আপনারা বাহুবলে দেশ রক্ষা করিতে না পারেন, তবে মস্তিষ্ক বলে দেশ রক্ষার চেষ্টা করুন।"

"সকলে নিরুত্তর, সভাস্থল নীরব। মহারাণী মৌনভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন, 'যদি দেশ ও সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব।"

"এইবার দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লেডী প্রিন্সিপাল (যিনি সৌরকর করায়ত্ত করিয়াছেন) উত্তর দিলেন। তিনি এতক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতেছিলেন–এখন অতি ধীরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন যে, বিজয় লাভের আশা ভরসা ত নাই, শত্রু প্রায় গৃহতোরণে। তবে তিনি একটি সঙ্কল্প স্থির করিয়াছেন–যদি এই উপায়ে শত্রু পরাজিত হয়, তবে ত সুখের বিষয়। এই উপায় ইতিপূর্বে আর কেহ অবলম্বন করে নাই–তিনিই প্রথমে এই উপায়ে শত্রু জয়ের চেষ্টা করিবেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা–যদি এই উপায়ে কৃতকার্য হওয়া না যায় তবে অবশ্য সকলে আত্মহত্যা করিবেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাহারা কিছুতেই দাসত্বশৃঙ্খল পরিবেন না। সেই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে মহারাণীর সভাগৃহ অবলাকণ্ঠের প্রতিজ্ঞা ধ্বনিতে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইল। প্রতিধ্বনি ততোধিক উল্লাসের স্বরে বলিল, 'আত্মহত্যা করিব!' সে যেন ততোধিক তেজোব্যঞ্জক স্বরে বলিল, 'বিদেশীয় অধীনতা স্বীকার করিব না'!"

"সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলেন, এবং লেডী প্রিন্সিপালকে তাঁহার নূতন উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন।"

লেডী প্রিন্সিপাল পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "আমরা যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে পুরুষদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা উচিত। আমি পর্দার অনুরোধে এই প্রার্থনা করি।" মহারাণী উত্তর করিলেন, "অবশ্য! তাহা ত হইবেই।"

"পর দিন মহারাণীর আদেশপত্রে দেশের পুরুষদিগকে জ্ঞাপন করা হইল যে, অবলারা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সে জন্য সমস্ত নগরে পর্দা হওয়া উচিত। সুতরাং স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার অনুরোধে পুরুষদের অন্তঃপুরে থাকিতে হইবে।"

"অবলার যুদ্ধযাত্রার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকেরা প্রথমে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; পরে ভাবিলেন, 'মন্দ কি?' তাঁহারা আহত এবং অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ছিলেন– যুদ্ধে আর রুচি ছিল না, কাজেই মহারাণীর এই আদেশকে তাঁহারা ঈশ্বর-প্রেরিত শুভ আশীর্বাদ মনে করিলেন। মহারাণীকে ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া তাঁহারা বিনা বাক্যব্যয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দেশরক্ষার কোন আশা নাই–মরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। দেশের ভক্তিমতী কন্যাগণ সমরচ্ছলে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের এ অন্তিম বাসনায় বাধা দেওয়ার প্রয়োজন কি? শেষটা কি হয়, দেখিয়া দেশভক্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষগণও আত্মহত্যা করিবেন।"

"অতঃপর লেডী প্রিন্সিপাল দুই সহস্র ছাত্রী সমভিব্যহারে সমর প্রাঙ্গণাভিমুখে যাত্রা করিলেন–"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "দেশের পুরুষদিগকে ত পর্দার অনুরোধে জেনানায় বন্দী করিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পর্দার আয়োজন করিলেন কিরূপে? উচ্চ প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া গুলিবর্ষণ করিয়াছিলেন না কি?"

"না ভাই! বন্দুক-গুলি ত নারী যোদ্ধাদের সঙ্গে ছিল না, –অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা থাকিলে আর বিদ্যালয়ের ছাত্রীর প্রয়োজন ছিল কি? আর শত্রুর বিরুদ্ধে পর্দার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না–যেহেতু তাহারা অনেক দূরে ছিল; বিশেষতঃ তাহারা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই অক্ষম ছিল।"

আমি রঙ্গ করিয়া বলিলাম, –"হয়ত রণভূমে মূর্তিমতী সৌদামিনীদের প্রভা দর্শনে তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া গিয়াছিল–"

"তাহাদের নয়ন ঝলসিয়াছিল সত্য, কিন্তু সৌদামিনীর প্রভায় নয়,– স্বয়ং তপনের প্রখর কিরণে!"...

গ্রামাঞ্চলে সজনা ও তালগাছ চাষের সম্ভাবনা
একটি উদ্ভাবনী ধারণা

কৃষিবিদ ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা

"একজন শিক্ষার্থী একটি খামার" হলো একটি স্বপ্ন যা দেশের জনগণের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে বসবাসরত সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় কৃষিকাজকে (খাদ্যশস্য, পশুপাখি পালন, মৎস্যচাষ, বনায়ন ইত্যাদি) জনপ্রিয় করা। আর এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হতে পারে প্রধানত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে। মূলত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমেই যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় বাগান তৈরি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, যে সব পরিবারে কোন শিক্ষার্থী নেই সেই সব পরিবারের কাছে সরকারের এই নির্দেশনা বাস্তবায়িত হতে পারে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের নিবিড় তত্ত্বাবধানে। তৃতীয়ত, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠির সাহায্যও নেয়া যেতে পারে। এই ধারণার অধীনে বিভিন্ন ধরনের কৃষির পাশাপাশি আমরা প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিটি ঘরে সজনা চাষের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি। এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এতে সরকারের কাছে বাজেট প্রণয়নের বিষয়ে কোন প্রস্তাবনার প্রয়োজন নেই। দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার স্থানীয় উৎসই এখানে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সজনা চাষ: সজনা (Moringa) দ্রুত বর্ধমান চিরসবুজ গাছের প্রজাতি যা ১৩টি প্রজাতির সমন্বয়ে গঠিত। তাদের ভারতবর্ষে আদিবাসী বলে ধারণা করা হয় যেখান থেকে এগুলি অনেক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে প্রবর্তিত হয়েছে এবং এখন বাংলাদেশসহ বিশ্ব জুড়ে চাষাবাদ হচ্ছে। সজনা গাছ মানবখাদ্যের জন্য পুষ্টির একটি নির্ভরযোগ্য উৎস এবং দেশীয় পদ্ধতিতে বিভিন্ন অসুস্থতার চিকিৎসা হিসাবে বিবেচিত হয়। সজনা গাছের পাতা এবং ফলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস এবং পুষ্টিগত ও ওষধি মানের ফাইটোকেমিক্যাল রয়েছে। ফলস্বরূপ, এটি একটি অলৌকিক গাছ হিসাবে বিবেচিত হয়। পাতা, ফল, ফুল এবং রোস্ট বীজ শাকসবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শিকড় একটি মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়; বীজ রান্না এবং প্রসাধনীর জন্য ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রোগ-প্রতিরোধক এবং নিরাময়মূলক যৌগ রয়েছে, যা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সজনা গাছ অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যে যেমন জলপরিশোধন, সবুজসার, মাইকোট্রফিক উদ্ভিদ, বনজ পুনরুদ্ধার, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, পশুর খাবার ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়। বহু অর্থনৈতিক গুরুত্ব, সহজ বংশবিস্তার এবং জলবায়ু ও মাটির বিভিন্ন অবস্থার অধীনে চাষাবাদে টেকসইতার কারণে উদ্ভিদটি বাংলাদেশে বৃহৎ আকারে চাষের জন্য উপযুক্ত।

উদ্ভিদটি অত্যন্ত খরাসহনশীল এবং শুষ্ক ও আধাশুষ্ক অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষ হয়। এটি বিভিন্ন ধরনের মাটিতে চাষ করা যেতে পারে তবে ভালভাবে শুকানো বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়। মাটির পিএইচ পাঁচ থেকে নয় সর্বোত্তম। সজনা বেশির ভাগ পোকামাকড় এবং রোগপ্রতিরোধী। এই সমস্ত পরিবেশগত কারণ এবং মাটির পরিস্থিতি বাংলাদেশে সজনা চাষের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। সজনেডাঁটা প্রধানত দুই প্রজাতির। এর মধ্যে এক প্রজাতি (বারোমাসি) বছরে তিন থেকে চারবার পাওয়া যায়। অন্য প্রজাতির সজনে বছরের গ্রীষ্ম মৌসুমে একবারই পাওয়া যায়। সজনে চাষের জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় না। এর জন্য আলাদা কোন জমিও প্রয়োজন হয় না। যদিও এটি জমির ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। যে কোন পতিত জমি, পুকুরপাড়,

রাস্তার বা বাঁধের ধার, বাড়ির আঙ্গিনা এমনকি শহরে যে কোন ফাঁকা শুষ্ক জায়গায় সজনে গাছ লাগানো যায়। সজনে বীজ, চারা এবং প্রধানত শাখা কাটা থেকে চাষ করা হয়। গাছের ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে রাখলেই সজনে গাছ জন্মায়। পতিত জমি, রাস্তার ধার, বাড়ির আঙ্গিনা বা শহরে বাসাবাড়ির আনাচেকানাচে সজনে গাছ লাগিয়ে অনেকেই বাড়ির চাহিদা মিটিয়েও বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি যে বসতবাড়িতে সজনা লাগানোর কাজটি সকল স্তরের শিক্ষার্থী করতে পারে। সকল ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও নির্দেশনায় শিক্ষামন্ত্রণালয়ের ও কৃষিমন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে সজনার আবাদ কার্যকর করা যেতে পারে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অগ্রণী ভূমিকা থাকবে। প্রাথমিকভাবে, যে শিক্ষার্থীরা সরকার থেকে বৃত্তি পাচ্ছেন তাদেরকে বৃক্ষ রোপণ করতে পরামর্শ দেওয়া হবে। তারপরে অন্যান্য শিক্ষার্থী একই প্রোগ্রামে যুক্ত থাকবে।

আমরা যদি বাংলাদেশের তিন কোটির বেশি পরিবারের প্রতিটি ঘরে একটি বা দুটি সজনা গাছ রোপণ করতে পারি তবে আমাদের কমপক্ষে ত্রিশ থেকে ষাট লক্ষ সজনা গাছ থাকবে। আমরা যদি প্রতিটি গাছ থেকে কমপক্ষে পাঁচ থেকে দশ কেজি ফল পাই তবে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে ফল খাওয়ার জন্য পাওয়া যাবে। এই করোনার সংকটে, সজনা ফল ও পাতা খাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতি এবং প্রতিরোধক্ষমতা উন্নত করবে। অন্যদিকে, এটি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে গ্রামাঞ্চলে সজনা চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশে টেকসই কৃষিক্ষেত্র নির্মাণে ও জলবায়ু পরিবর্তন নিরসনে কাজ করবে। এটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেরও কাজ করবে।

তালগাছ রোপণ: বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি খেজুর প্রজাতির গাছ পাওয়া যায় এবং এগুলো পাহাড় থেকে সমভূমি এমনকি ম্যানগ্রোভ বনে পাওয়া যায়। তাল তাদের মধ্যে একটি। এটি খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া উদ্ভিদ এবং একশো থেকে একশো পঞ্চাশ বছর বাঁচতে পারে। তালগাছ বীজ থেকে হয়। তালগাছ একটি স্টাউট, স্ট্রেট, আন-ব্রাঞ্চযুক্ত নলাকার ট্রাঙ্ক এবং শীর্ষে বড় পাতার একটি মুকুট রয়েছে। সাধারণ নাম: তাল, এশিয়ান পল্মির পাম, টডির পাম । গাছটি পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিটার উচ্চতা অর্জন করতে পারে। ট্রাঙ্ক এক মিটার জুড়ে হতে পারে। এর আসল বাড়ি দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এটি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, পুকুরের পাশে এবং রাস্তার পাশে পাওয়া যায়। পুষ্পমঞ্জলটি অনেকগুলি ফুলের সাথে বড়, অক্ষের উপর একটি বন্ধ সর্পিল সাজানো। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদাভাবে জন্মায়। মহিলা গাছপালা ফল দেয়। বীজ দ্বারা প্রচার হয়। পুরুষ ও স্ত্রী উভয় উদ্ভিদ থেকে এক ধরনের রস আহরণ করা হয় যা গুড় তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এর ট্রাঙ্কটি পিলার হিসাবে ব্যবহৃত হয় যা খুব শক্তিশালী। এর পাতাগুলি হাতের পাখা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। এই গাছের পাতাগুলি কাগজ হিসাবে লেখার জন্য ব্যবহৃত হত। তালের রস শক্তিশালী এবং উত্তেজক। গুড় এবং চিনি রস থেকে উৎপাদিত হতে পারে এবং এগুলি অনেক সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত হয়।

তালগাছ বজ্রপাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করে। আমাদের মধ্যে যারা গ্রামীণ অঞ্চলে বাস করেন তারা অনেক সময় দেখা যায় বিদ্যুতের আঘাতকালে কোন জায়গা খুঁজে না পেয়ে আশ্রয়ের জন্য গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। যাই হোক, এ ধরনের আশ্রয় সন্ধান অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

সম্প্রতি, বজ্রপাতে মৃত্যুর হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণা দাবি করেছে যে গত আট বছরে বজ্রপাতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে এবং মোট ১৮০০তে পৌঁছেছে। নিহতদের বেশিরভাগ হলেন প্রান্তিক কৃষক এবং খামারশ্রমিক। যুগযুগ ধরে প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে লড়াই করে আসা তৃণমূল কৃষকদের এটি অনিবার্য ভাগ্য। জীবিকার তাগিদে কৃষকদের প্রকৃতির সাথে থাকতে হবে। প্রকৃতি প্রতিকূল হয়ে উঠলে সাধারণ কৃষকদের সেই শাস্তিও মেনে নিতে হয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে বজ্রপাতজনিত মৃত্যু বৃদ্ধির মূল কারণগুলির মধ্যে তালগাছ এবং খেজুর গাছের ঘাটতি অন্যতম। এর আগে বজ্রপাত তালগাছ বা অন্যকোন বড় গাছে হত। বজ্রপাত একধরনের বিদ্যুত। সুতরাং বজ্রপাত গাছের মধ্য দিয়ে মাটিতে নামত, সবাই জানি।

বজ্রপাত থেকে কৃষকদের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে হাজার হাজার তালগাছ রোপণ করা হয়েছে। দুর্যোগ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছর বাংলাদেশে প্রায় ৩০০ জন বেশি মারা গিয়েছিল বজ্রপাতে। ২০১৬ সালে একক ঝড়ের দিনে আশি জন মারা গিয়েছিলেন।

বাজ সুরক্ষা ব্যবস্থা এখন দেশের জাতীয় দুর্যোগ পরিচালনা পরিকল্পনা এবং এর জাতীয় বিল্ডিং কোডের একটিঅংশ।

তালগাছের জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় না। এর জন্য আলাদা কোন জমিও প্রয়োজন হয় না। যে কোন পতিত জমি, পুকুরপাড়, রাস্তা বা বাঁধের ধার, বাড়ির আঙ্গিনা এমনকি শহরে যে কোন ফাঁকা শুষ্ক জায়গায় তালগাছ লাগানো যায়। যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি যে বসতবাড়িতে তালগাছ লাগানোর কাজটি সকল স্তরের শিক্ষার্থী করতে পারে।

এখন অনেক প্রতিষ্ঠান রাস্তার ধারে তালগাছ রোপণ করছে, কিন্তু বজ্রপাত আমাদের কৃষককে খোলামাঠে আঘাত করছে। আমাদের উদ্ভাবনী কর্মসূচিতে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবো–আমরা সরাসরি মাঠে তালগাছ লাগাব। আমাদের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে। আমরা সরাসরি বন্যাপ্রবণ মাটিতে এবং প্লাবিত মাটিতে গাছ লাগাব, আমরা চাষকৃত জমির কোণে মাটির উঁচু নিতম্বের মধ্যে চারা রোপণ করব। যাতে বন্যা মৌসুমে চারা বেঁচে থাকে।

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে গ্রামাঞ্চলে তালগাছ রোপণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ বজ্রপাতের হাত থেকে সুরক্ষা পেতে পারে এবং এটি জলবায়ু পরিবর্তন নিরসনে কাজ করবে। এটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেরও কাজ করবে। তাছাড়া, তালগাছ তাদের অপরিপক্ক ফল এবং পরিপক্ক ফল থেকে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার সরবরাহ করতে পারে এবং কাঠ ও জ্বালানি সরবরাহ করতে পারে।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; এবং সদস্য, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক উপকমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সজনা ও তালগাছ চাষ ও সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১৩ জুন ২০২২ সিদীপের আশুলিয়া, সোনারগাঁও, নবীগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ এরিয়ার ১৫ জন শিক্ষাসুপারভাইজারের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সজনা ও তালগাছ চাষ ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কৃষিবিদ অধ্যাপক ড. মো. আমিন উদ্দিন মৃধা, পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম ও সিদীপের চেয়ারম্যান জনাব ফজলুল বারি।

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, পরিচালক (ফিন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন্স) জনাব এস. এ. আহাদ এবং গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা আলমগীর খান। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ফ্যাসিলিটেট করেন ম্যানেজার (ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও অর্গ্যানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট) ফারহানা ইয়াসমিন।

সবশেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ কর্ম-এলাকায় সজনা ও তালগাছ চাষ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

গ্রামগঞ্জে গজিয়ে ওঠা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও করণীয়

কাজী বজলুর রহমান

গজিয়ে ওঠা প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী হচ্ছে? সেখানে সত্যিই সুষ্ঠু পাঠদান হচ্ছে নাকি পাঠদানের নামে শুধুই ব্যবসা কেন্দ্র খুলে বসা হয়েছে। কারাই বা এখানে পাঠদান করছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে দেখা দরকার। আমি শহর এলাকায় বাস করি না, গ্রামে থাকি। তাই গ্রামগঞ্জে গজিয়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন, হাইস্কুল ও কলেজের কথাই বলব।

প্রথমেই আমি কিন্ডারগার্টেনের কথা বলছি–এখানে শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। শিশু শ্রেণিতে ৪ বছরের শিশুকে ভর্তি করা হয়। অভিভাবককে বোঝানো হয় যে, শিশু স্কুলে আসাযাওয়া করতে থাকুক আর অভ্যাস গড়ে উঠুক। কিন্তু পাঠের জন্য চাপ দেয়া চলতে থাকে। সে কান্নকাটি শুরু করে এবং মায়ের হাত ছাড়ে না। মাও ভাবে আমার সন্তান ছোট বেলা থেকে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়ে যাক। মা ও সন্তান এভাবে কিছু দিন শ্রেণিকক্ষে এক সঙ্গে পাঠ গ্রহণ করেন। যদি ভাগ্য ভালো হয় তবে সন্তানটি টিকে যায়, না হলে এক-দুই বছর এইভাবে চলার পর মাও ক্লান্ত হয়ে অবশেষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

যারা টিকে যায় তারা প্লে, নার্সারি শেষ করে প্রথম শ্রেণিতে উঠে যায়। প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত আস্তে আস্তে অর্ধেক শিক্ষার্থী ঝরে যায়। আর এদের পিঠে শিশু শ্রেণি থেকেই এক গাদা বইখাতার ব্যাগ চাপিয়ে দেওয়া হয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ছাড়াও বিশেষ কোচিং করানো হয়। আর এরই মধ্যে অভিভাবকের পকেট কেটে স্কুল-মালিকের পকেট ভারি হতে থাকে। প্রথম শ্রেণি থেকে বোর্ড বই এই শিক্ষার্থীরা পেলেও তা গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয় না। পড়ানো হয় স্কুল-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বই যা সর্বোচ্চ মূল্যে স্কুল-কর্তৃপক্ষ বিক্রি করে থাকেন। খাতা-কলম পর্যন্ত উচ্চ মূল্যে স্কুল থেকেই কিনতে হয়। এছাড়া পোষাক, ব্যাচ, টাই ইত্যাদিতো আছেই। অপর পক্ষে শ্রেণি কক্ষের সুবিধা নেই বললেই চলে। কোন রকম একটা ঘর যেখানে যথেষ্ট আলো বাতাসের ব্যবস্থা নেই, নেই ভালো কোন চেয়ারবেঞ্চের ব্যবস্থা, নেই পাঠদানের উপকরণ। গাদাগাদি করে একটা ছোট বেঞ্চে ৪-৫ জন করে বসান শিক্ষক।

কোয়ালিফাইড শিক্ষক নিয়োগ দিতে হলে ন্যূনতম একটা বেতন তাদের দিতে হয়। কিন্তু যারা এখানে শিক্ষকতা করেন তাদের একটা হাস্যকর বেতন (১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা) দেয়া হয়। এত কম বেতনেও তারা এখানে শিক্ষকতা করেন, কারণ তাদের আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তারা খানিকটা পুষিয়ে নেন সেই স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়িয়ে। একটা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে প্রাইভেটের জন্য ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা কেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাদের ছেলেমেয়ে ভর্তি না করে প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করেন তার প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি:

১। ভর্তির মৌসুমে এই সকল স্কুলের মালিক পক্ষ ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ সুনিপুণভাবে বুঝাতে সক্ষম হন যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখার মান ভাল নয়। তার প্রমাণ ৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় প্রাইভেট স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীরা ভাল ফল করে।

২। সারা বছর ধরে শ্রেণিকক্ষে পাঠাদন করা হয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত এত ছুটি থাকে না।

৩। ছোট থেকেই বিদ্যালয়ে পাঠালে, নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে শিক্ষার্থী বড় হয়ে উঠলে পড়ালেখা ভাল হয়।

৪। শিক্ষার্থী যদি ছেলে হয় তাহলে তো কথাই নেই, তার পেছনে পিতামাতা ব্যয়ে কুণ্ঠিত হন না। অর্থ যাই লাগুক ছেলে তো মানুষ করতে হবে। সঙ্গতি থাকুক বা না থাকুক এই ইগো কাজ করে। ফলে ছেলে যে মানসিকভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তা চিন্তা করে না।

৫। পিতা যদি বিদেশে কর্মরত থাকেন তাহলে ছেলে বা মেয়েকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ানোই যাবে না। কিন্ডারগার্টেনে পড়িয়ে পিতার স্বপ্নপূরণ করতেই হবে।

এখন প্রাইভেট উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজগুলোর কথায় যাব। এখানেও কিন্ডাগার্টেনের মতই স্বল্প পরিসরে গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীদের বসানো হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে ব্যবসা। শিক্ষার্থীদের উচ্চ বেতন আর বোর্ডের বই ছাড়াও থাকে বাড়তি বইয়ের বোঝা। পোষাক, ব্যাচ, টাই, খাতাকলম ইত্যাদি স্কুল থেকেই উচ্চ মূল্যে কিনতে হয়। এ চাঁদা সে চাঁদাতো আছেই। এখানে নেই বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য ল্যাব, নেই কোন লাইব্রেরি, আইসিটি শিক্ষার জন্য তাদের বি.এড. বা এম.এড. করা নেই। এরা বেশিরভাগ সদ্য পাশ করা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর, অনত্র চাকুরির জন্য চেষ্টা করছেন কিন্তু ভাল কিছু হচ্ছে না তাই এখানে আছেন, কেউবা প্রাইভেট পড়ানোর শিক্ষার্থী পাওয়া যাবে তাই এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বল্প বেতনে (২০০০ থেকে ৩০০০ টাকা) যুক্ত থাকেন। কেউবা কোন

বেসরকারি স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা করেন, স্কুল বা কলেজে যাওয়া অথবা ২/৩টি ক্লাস নিয়ে তাড়াহুড়া করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে যান। যেহেতু তিনি ক্লান্ত, তাই তার মূল কাজটি ঠিকমত করতে পারেন না। সাধারণত এই সকল প্রাইভেট স্কুলকলেজের মালিক বা মালিকগণের একজন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকগণ হয়ে থাকেন। তাই সে যে শুধু ক্লাস নিয়েই ক্লান্ত থাকেন তা নয়। প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানটির যাবতীয় কাজও তাকে করতে হয়। ফলে শিক্ষার প্রতি তিনি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেন না। শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, রেজিস্ট্রেশন, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা বোর্ডের বই সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এত কিছুর পরও অভিভাবকগণ কেন এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করান তার কারণ:

১। চমকপ্রদ প্রচার।

২। অভিভাবকের আশা যে সন্তান মানুষ হবে।

৩। বেসরকারি স্কুলকলেজের সফলতা।

৪। কিছুটা হলেও বেসরকারি শিক্ষা প্রতষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে বেশি সময় ধরে পাঠদান করা হয়।

তাহলে গজিয়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলো যে ব্যবসা খুলে বসেছে তা জেনেও কেন সরকার এগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, বরং সায় দিচ্ছে। তার কারণ সরকার চায় যে কোন উপায়ে জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠুক। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠানকে ভাল মানের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে নিম্নলিখিত কিছু পদক্ষেপ নিলে ভাল হবে বলে আমার বিশ্বাস:

১. প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলোর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা।

২. শিক্ষার্থীর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা।

৩. যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীদের দেখভাল করা।

৪. শ্রেণিকক্ষের উন্নয়ন করা।

৫. ছাত্রছাত্রীর মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি সহনশীল পর্যায়ে নির্ধারণ করা।

৬. শিক্ষা উপকরণ, ল্যাব, লাইব্রেরি, আইসিটি শিক্ষার ল্যাব ইত্যাদি থাকা বাধ্যতামূলক করা।

৭. শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা।

৮. শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করা অর্থাৎ বি.এড., এম.এড, করার সুযোগ দেওয়া।

৯. শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করা।

১০. বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোন শিক্ষক-কর্মচারী এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মালিক বা শিক্ষক হতে পারবেন না।

১১. যারা এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন তাদেরও একটা ন্যূনতম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এই নিবন্ধে আমি গ্রামগঞ্জে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সামান্য ধারণা তুলে ধরলাম। এখন শিক্ষাবিষয়ক গবেষক যারা আছেন তারা গবেষণা করে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নত প্রতিষ্ঠানে রূপদান করে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং আমরা একটা সুশিক্ষিত ও উন্নত জাতি হিসাবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করব–এই আশাই রইল।

লেখক: বেসরকারি শিক্ষপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন অধ্যক্ষ

> এদের পিঠে শিশু শ্রেণি থেকেই এক গাদা বইখাতার ব্যাগ চাপিয়ে দেওয়া হয়। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ছাড়াও বিশেষ কোচিং করানো হয়। আর এরই মধ্যে অভিভাবকের পকেট কেটে স্কুল-মালিকের পকেট ভারি হতে থাকে। প্রথম শ্রেণি থেকে বোর্ড বই এই শিক্ষার্থীরা পেলেও তা গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয় না। পড়ানো হয় স্কুল-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বই যা সর্বোচ্চ মূল্যে স্কুল-কর্তৃপক্ষ বিক্রি করে থাকেন

শৈশবের ছোট্ট বেলা

আবু রায়হান
উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার
বালুচর ব্রাঞ্চ, পাবনা এরিয়া, সিদীপ

মনে আজ দেয় দোলা
সেই শৈশবের ছোট্টবেলাটা
মনে মনে খুঁজে ফিরি
জীবনের সেরা সময়টা।

সকালের পাঠশালা খুনসুটি বেলটা
দুপুরে মায়ের হাতে
গরম গরম মাছ-ভাত খাবারটা।
বিকেলের খেলাধুলা
ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরা সময়টা।

সন্ধে নাচ-গান
তেরে কেটে তাধিন
জীবনটা ছিল যেন
একেবারে স্বাধীন।

হাসিখুশি ভরা ছিল
দিনগুলি সেই সব
আর কি ফিরিবে কভু
রাঙ্গা সেই শৈশব।

বিজ্ঞানের দিকপাল আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

অলোক আচার্য

আজ বিজ্ঞানের জয়জয়কার। বহু না জানা প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে। এসবের পেছনে যারা আছেন তারা বিজ্ঞানি। প্রতিটি আবিষ্কারই গুরুত্বপূর্ণ এবং মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে কোনো কোনো আবিষ্কার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এসবের আবিষ্কারকগণ পৃথিবীকেই বদলে দিয়েছেন।

আমাদের আছে তেমন একজন বিজ্ঞানি–জগদীশচন্দ্র বসু। ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে ইউরোপ-আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছিলেন তিনি। বিজ্ঞানের প্রতি গভীর অনুরাগে বিজ্ঞানের সাধনায় আজন্ম ডুবে ছিলেন। তার কাজই তার মূল্যায়ন করে। আইনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে কোনোটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত। আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ভারতের কোনোও বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি জগদীশ। এই মানুষটি ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চার জনক। আমরা সবাই এই মানুষটিকে চিনি গাছের প্রাণ আছে এটি প্রমাণ করার বিজ্ঞানি হিসেবে। বাস্তবিক অর্থে এটি তার বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কারণ গাছের প্রাণ আছে এরকম একটা ধারণা আগেই মানুষের মাঝে ছিল। গাছ জন্ম নেয়, বড় হয় এবং মারাও যায়। কিন্তু আঘাত করলে গাছ কিভাবে সাড়া দেয় এই বিষয়টি স্পষ্ট করেন জগদীশচন্দ্র বসু। তাকে জানতে হলে চিনতে হলে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

বিজ্ঞানি জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম ১৮৫৮ সালো ৩০ নভেম্বর ময়মনসিংহে। তার পরিবারের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের রাঢ়িখালে। পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু। ভগবানচন্দ্র একজন প্রধান শিক্ষক এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি একজন পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি করলেও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর এবং সেখান থেকেই তিনি সন্তানকে ভর্তি করান ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে। তিনি মনে করতেন ইংরেজি শেখার আগে এদেশীয় ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা আয়ত্ত করা উচিত।

জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৭৯ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর বাবার ইচ্ছা ও আগ্রহে তিনি ১৮৮০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ার উদ্দেশ্যে লন্ডনে যান। কিন্তু অসুস্থতার কারণে বেশিদিন এই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। ১৮৮৫ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, আত্মসচেতন এবং আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, ভারতে ফিরে তিনি যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে। সেখানে তাকে গবেষণার জন্য কোনো উপযুক্ত সুযোগসুবিধা দেয়া হতো না এবং তাকে ইউরোপীয় অধ্যাপকদের অর্ধেক বেতনেরও কম অর্থ দেয়া হতো। এর প্রতিবাদস্বরূপ সেখান থেকে তিনি বেতন নেয়া বন্ধ করে দেন এবং তিন বছর অবৈতনিকভাবেই অধ্যাপনা চালিয়ে যান। তার এই প্রতিবাদের ফলে তার বেতন ইউরোপীয়দের সমতুল্য করা হয়।

১৮৮৭ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত সংস্কারক দুর্গামোহন দাশের কন্যা অবলা বসুর সাথে। এ সময় তিনি বিভিন্ন কারণে অর্থসংকটে ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে আঠারো মাস গবেষণা করেছেন অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ নিয়ে। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোনো তার ছাড়া একস্থান থেকে অন্য স্থানে তা প্রেরণে সফলতা পান। ১৮৯৯ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত জীব ও জড় বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ওপর গবেষণার কাজ করেছিলেন। তিনিই প্রথম বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে মিলিমিটার পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সক্ষম হন। তার বক্তৃতায় বারবার স্বদেশপ্রেমের বিষয়টি উঠে এসেছে।

জগদীশ চন্দ্র বসুর আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তা হলো তাঁর লেখক পরিচয়। তিনি লিখেছেন কল্পবিজ্ঞান নিয়ে গল্প 'নিরুদ্দেশের কাহিনী' যা 'পলাতক তুফান' নামে প্রকাশিত হয়। তার একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'অব্যক্ত'। এই মহান বিজ্ঞানী ২৩ নভেম্বর ১৯৩৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

লেখক: শিক্ষক ও মুক্তগদ্য লেখক

নক্ষত্রের ঝরে পড়া

একজন তরুণ বিজ্ঞানীর অকাল প্রয়াণ

আলমগীর খান

অঞ্জনের কাছে বিজ্ঞানচর্চা কোনো সমাজবিচ্ছিন্ন বিষয় ছিলো না। তিনি বিজ্ঞানকে বুদ্ধির জিমন্যাস্টিকস মনে করতেন না। তাই তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান সমাজসচেতন মানুষ। সমাজ, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানচর্চা যে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত একথা তিনি ভালভাবে জানতেন। সেজন্য নিছক বিজ্ঞানচর্চা বাড়ানো নিয়ে তার মায়াকান্না ছিলো না। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর যেখানে প্রত্যেকের সৃষ্টিশীলতা বিকশিত হতে পারে। অমন একটা কাঙ্ক্ষিত সমাজকাঠোমোই কেবল লালন করতে পারে তরুণ শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন ও প্রতিভাকে

আজ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের অভাব। আর এই সংকট সবচেয়ে বেশি প্রকট বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানবিষয়-উত্তীর্ণদের মাঝে, অর্থাৎ যারা বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ালেখা করে অর্জিত দক্ষতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন–যেমন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি। বরং দেখা যায়, যারা কলা ও মানবিক বিদ্যা নিয়ে পড়ালেখা করে তারা বেশি বিজ্ঞানমনস্ক। এই অবস্থা থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয় যে, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই যে নবম শ্রেণি থেকেই খুব মেধাবী বলে প্রমাণ দিতে সক্ষম ছেলেমেয়েদেরকে বিজ্ঞানে ভর্তি করা হয়, আর তার প্রমাণ দিতে অক্ষমদেরকে সাধারণত মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি করা হয়–তার ন্যূনতম যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

এ ট্র্যাজিক পরিস্থিতির একাধিক কারণ আছে। মূল কারণ হচ্ছে আমাদের স্কুলকলেজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ বিজ্ঞানের দর্শন শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ও উদ্যোগ নেই। তদুপরি মানবিক বিদ্যায় কিছু বৃহৎ জীবনদৃষ্টির উপস্থিতি থাকলেও তথাকথিত 'বিজ্ঞানশিক্ষা'টা বড়ির মত করে খেতে দেয়া হয়, তাও তেতো, অন্তত হোমিওপ্যাথির গ্লোবিউলের মত মিষ্টিও নয়। ফল যা হবার তাই হয়, ক্যাপসুল আকারে বিজ্ঞান গিলে গিলে আমাদের দেশে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের মত বড় বড় পেশাদার তৈরি হন। এইসব ক্যাপসুল কিছু দক্ষতা শেখায়। আগের দিনে যেসব দক্ষতা পারিবারিক অভিভাবক বা গুরুর কাছ থেকে

শিখতে হতো সেসব–তবে এখন সরকারি বা ব্যয়বহুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে–এ থেকে বিযুক্ত হয় সামাজিক দায়বোধ যা পূর্বে একইরূপ পেশাদার যথা বৈদ্য ও মিস্ত্রিদের থাকতো।

তথাকথিত এসব অত্যাশ্চর্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের জীবনের আদর্শ পরিণতি পায় উচ্চউপার্জনশীল কোনো পেশাদার হওয়ায়। বিজ্ঞান হচ্ছে অসীম কৌতূহল সৃষ্টি ও তা নিবৃত্তির অসীম যাত্রা। অথচ আমাদের তথাকথিত বিজ্ঞানশিক্ষায় যা করা হয় তা হচ্ছে সেই অমূল্য কৌতূহলের রক্তাক্ত খুন। এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষা শিক্ষার্থীদের মনে কেবল অর্থ-কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই তৈরি করে না। নাবালক বয়স থেকেই বিজ্ঞান-পড়া এইসব অত্যাশ্চর্য মেধাবীরা সাধারণত বিজ্ঞানের জগৎ থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে সরে যায়। তাদের উর্বর জাদুর মাথা থেকে কদাচিৎ আবিষ্কার-উদ্ভাবনের মত কিছু বেরোয়–সে অধ্যবসায়ও নেই বললে চলে। ঢাকার শহরে দুয়েকটা বাড়ি, ছেলেমেয়ে বিদেশে পড়তে পাঠানো ও প্রতিষ্ঠা করা এবং মোটা ব্যাংক ব্যালান্স–জীবনের সার্থকতার মানে তাদের এই। যাদের কাছে তারা সেবা বিক্রি করে এই সার্থকতা অর্জন করে তারা অধিকাংশই তাদের সেবায় অসন্তুষ্ট। সামাজিক-নৈতিক দায়বোধ দূরে থাকুক–কাস্টোমার স্যাটিসফ্যাকশন বা খরিদ্দারের তৃপ্তিও তাদের দায়বোধের সীমায় নেই।

এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ সম্প্রতি দেশ হারিয়েছে একজন তরুণ বিজ্ঞানিকে যিনি একজন মেধাবী প্রকৌশলী, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার এইসব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন। সেটিই তার কাল হলো। গাড়ি-বাড়ি, ছেলেকে বিদেশে প্রতিষ্ঠা করা ও ব্যাংক ব্যালান্স ছাড়াই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি–সমাজের ও রাষ্ট্রের দৃষ্টির আড়ালে। তিনি লেখক, বিজ্ঞান-সাধক ও কাঠের গুঁড়া থেকে বিকল্প জ্বালানির উদ্ভাবক আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জন। জন্ম ৩০ জুন ১৯৭৬ সালে পাবনায় বেড়া উপজেলার নতুন ভারেঙ্গা গ্রামে। আর মৃত্যু সম্প্রতি ১৯ মে ঢাকায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগে।

চাকুরির দাসত্ব ও কেরানিগিরির জীবনকে পিছনে ফেলে তিনি মনোযোগ দিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনে ও শিক্ষাকর্মে। উচ্ছিষ্ট থেকে জ্বালানি তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৯এ সরকারের পক্ষ থেকে 'মেধা সম্পদ সুরক্ষা সম্মাননা' লাভ করেন তিনি। এ জ্বালানি সম্পর্কে তিনি শিক্ষালোকে লিখেছেন, "এটি তৈরির সকল যন্ত্রপাতির নক্সা থেকে সংযোজন সবই করেছি আমি, এই বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে বসে। ... প্রথম গবেষণাটি ফেলনা কাঠের গুঁড়ো থেকে হলেও আমার উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া ও যন্ত্র এখন এতটাই সক্ষম যে এটি এখন নষ্ট হয়ে যাওয়া কাঠ, বাঁশ, ঘাস, গাছের পাতা, তরিতরকারির উচ্ছিষ্ট, খড়, ক্ষেতের আগাছা সবকিছুকেই জ্বালানিতে রূপান্তর করতে সক্ষম।"

কাঠের গুঁড়া থেকে এ জ্বালানি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য তিনি পাবনার নাটিয়াবাড়িতে নিজ গ্রামে 'প্রযুক্তি' নামে একটি কারখানা গড়ে তোলেন। কিন্তু হঠাৎ স্থানীয় একটি স্কুলে শিক্ষকতা তাকে নেশার মত পেয়ে বসে। পর্যাপ্ত মনোযোগের অভাবে ও দুর্নীতিগ্রস্তদের পাল্লায় পড়ে কারখানাটি মোটা অংকের ক্ষতির সম্মুখীন

হয়। অবশেষে আর্থিক অনটনের কবলে পড়ে তিনি কারখানাটি নতুন করে শুরু করার উদ্যোগ নেন। এর মাঝেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

খ্যাতিমান বিজ্ঞানি জামাল নজরুল ইসলামকে নিয়ে একটি পোস্ট প্রায়ই ফেসবুকে ঘুরতে দেখা যায়। যতদূর জানি এর উৎস বেশ আগে অঞ্জনের একটি পোস্ট। 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' ছোটকাগজে (ফেব্রুয়ারি ২০২০, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) তিনি বিজ্ঞানি জামালকে নিয়ে লেখেন: "কেমব্রিজ ভার্সিটির অধ্যাপকের পদ, সোয়া লাখ টাকা বেতন; সম্মানের লেভেলটা বুঝতে পারছেন তো? এই চাকুরি অবলীলায় ছেড়ে দিয়ে এইদেশে চলে এসেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাত্র তিন হাজার টাকার চাকুরিতে। ভাবতে পারছেন? আপনি কিংবা আমি হলে এই লোভনীয় সুযোগ হাতছাড়া করতে পারতাম? হকিংয়ের বন্ধু আর রুমমেট ড. জামাল নজরুল ইসলাম বিশ্বের রথী-মহারথীদের দৃষ্টি তাঁর দিকে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন একটি চিন্তা আর একটি বই দিয়ে। তাঁর গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই পদার্থবিজ্ঞানের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।"

'আমাদের বিজ্ঞানচর্চা' শীর্ষক একটি লেখায় অঞ্জন লিখেছেন, "প্রতিদিনের হিসাবে আমাদের এই পৃথিবী ২.৫৭৩ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে। সেই হিসেবে আমরা পঞ্চাশ বছর পূর্বের থেকে ৪৭,০০০ মিলিয়ন কিলোমিটার বা ৪৭ বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছি। এই দূরত্ব পেরিয়ে এসে আমরা এখন কোথায়? আমাদের অর্জন কি? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যতক্ষণ একটা জাতির কৃষ্টি-কালচারের মধ্যে মিলেমিশে একাকার না হয় ততক্ষণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধুই বিজ্ঞান বইয়ের কিছু অধ্যায় মাত্র।"

মৃত্যুর মাত্র দেড় মাস আগে ১ এপ্রিল ঢাকায় '৪র্থ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলনে' তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধ 'বায়োম্যাস ফুয়েল: উচ্ছিষ্ট বস্তু থেকে তৈরি জ্বালানি' উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে। পরে অনেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁর উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে।

অঞ্জনের কাছে বিজ্ঞানচর্চা কোনো সমাজবিচ্ছিন্ন বিষয় ছিলো না। তিনি বিজ্ঞানকে বুদ্ধির জিমন্যাস্টিকস মনে করতেন না। তাই তিনি ছিলেন একজন সংস্কৃতিবান সমাজসচেতন মানুষ। সমাজ, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানচর্চা যে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত একথা তিনি ভালভাবে জানতেন। সেজন্য নিছক বিজ্ঞানচর্চা বাড়ানো নিয়ে তার মায়াকান্না ছিলো না। তিনি স্বপ্ন দেখতেন এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর যেখানে প্রত্যেকের সৃষ্টিশীলতা বিকশিত হতে পারে। অমন একটা কাঙ্ক্ষিত সমাজকাঠোমোই কেবল লালন করতে পারে তরুণ শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন ও প্রতিভাকে।

এমন স্বপ্ন ও প্রতিভা নিয়েই অঞ্জন পৃথিবীতে এসেছিলেন। কিন্তু আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো তাকে লালন করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই হয়তো তিনি অতি তাড়াতাড়ি আবার এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। তার 'প্রযুক্তি' প্রকল্পটি সচেতন মহলের ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক প্রণোদনা লাভ করতে পারেনি। আবার অর্থলোভমুক্ত 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মত্ত এই মেধাবী মানুষটি ব্যক্তিগত জীবনেও কিছুদিন বেশ কিছু সংকটের মুখোমুখি হন। যা হয়তো তাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিয়েছিলো।

'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি'র দ্বিতীয় সংখ্যায় তিনি শিল্পীসাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীদের জীবনে ঘটা কিছু মজার ভুল যা নতুন নতুন আবিষ্কারের দরজা খুলে দেয় তা নিয়ে লিখেছিলেন– 'ভুলের ভয় কি?" আর এ ছোটকাগজটির চলতি সংখ্যায় (মে ২০২২) তার একটি চমৎকার লেখা বেকারত্ব নিয়ে। যেখানে অঞ্জন লিখেছেন, "বিগত দুই দশকে কি আমাদের বেকারদের নিয়ে কোন সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় চিন্তন তৈরি হয়েছে? এই বেকাররা হয়তো কোন না কোনভাবে একটা আর্থসামাজিক জীবন কাঠামো তৈরি করে নেয়, কিন্তু দেশ ও জাতি যে এক বিরাট প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, কারও সেদিকে তাকাবার সময় নেই। এই বেকারদের এক বিরাট অংশই কিন্তু দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে দেশের জন্য কিছু করতে চায়। যতদূর মনে পড়ে, চল্লিশের দশকে চীনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়, ট্রেড কোর্সে ভর্তি হবার জন্য বাধ্যবাধকতা শুরু হয়। ফলাফল কতটা ইতিবাচক সেটা এই প্রজন্মের চীনকে দেখলেই বোঝা যায়। একটা জাতির বেড়ে ওঠার গল্প আর একটি গাছের বেড়ে ওঠার গল্প অনেকটাই এক। কোন এক প্রজন্মের ত্যাগ পরবর্তী বহু প্রজন্মকে ফুলেফলে শোভিত করে। কোন প্রজন্ম এই দায়িত্বকে কাঁধে নেবে?"

লেখাটি তিনি শেষ করেছেন এভাবে: "লুই আই কানকে অনেক কারণেই বাংলাদেশের মানুষেরা খুব ভালো করে চেনেন। জীবনের একটা বড় সময়ই তিনি ছিলেন বেকার। হঠাৎ করে আসা সুযোগ, জীবনের প্রথম প্রোজেক্ট থিম এক্সপ্লেনেশনে মনের মাধুরি নিয়ে বলতে শুরু করেন, 'এটা কি? এটা একটা ইট। এই ইটটিও কিছু একটা হয়ে উঠতে চায়, ইটের পর ইট, তৈরি হয় দেয়াল।' ... আমাদের বেকারদের কপালে এমন সুযোগ আসে কি? কোন মানুষই গুণহীন নয়, প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু হয়ে উঠতে চায়। এই কিছু করার সুযোগ যদি এরা পায়, বলাই বাহুল্য অগুনতি লুই আই কান তখন আমাদের চারপাশে থাকবে।"

অঞ্জন ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক, উন্নত সাংস্কৃতিক ও নৈতিক চেতনাসমৃদ্ধ এক বিজ্ঞানপ্রেমী লেখক। তার মৃত্যুতে আমি হারিয়েছি এক মহান বন্ধুকে আর দেশ হারিয়েছে এক প্রতিভাবান লেখক, বিজ্ঞানসাধক, উদ্ভাবক ও নিয়ত সৃষ্টিশীল মানুষকে।

মানবিক বিশ্বের জন্য সমাজকর্ম

সমাজকর্মের ইতিহাস আমাদের দেশে বেশ পুরনো হলেও সমাজকর্ম এখনও একটি উল্লেখযোগ্য পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদাও অর্জিত হয়নি। স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলেমেয়ে সাধারণত একে পেশা হিসেবে গ্রহণের স্বপ্ন দেখে না। যদিও এখন দেশে উন্নয়ন, সেবা ও জনসচেতনায়ন কর্মে বহু সংস্থা কাজ করছে আর তাতে বহু কর্মী নিযুক্ত। এসব ক্ষেত্রে কাজকর্মের চাহিদা বিশ্বব্যাপী বাড়ছে। কিন্তু বাংলাদেশে সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে অনুভূত হচ্ছে না, তাই এর বিস্তৃতি হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে। সমাজকর্মকে আরও বৈচিত্র্যময়, গবেষণা-সমৃদ্ধ, পরিবর্তনকামী, দীর্ঘমেয়াদী ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে সমাজকর্মকে পূর্বের চেয়ে বেশি বৈশ্বিক প্রক্ষাপটের হিসাব রাখতে হবে–যেমন পরিবেশের ভারসাম্য, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন, মানুষের আয়-বৈষম্য ইত্যাদি। সেজন্যই এবারকার বিশ্ব সমাজকর্ম দিবসের প্রতিপাদ্য: একটি নতুন ইকো-সামাজিক বিশ্ব নির্মাণ: কাউকে পিছনে না রেখে (Co-building a New Eco-Social World: Leaving No One Behind)। সেইসঙ্গে 'সামাজিক সহনশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে'র (Achieving Community Resilience and SDGs) প্রতিশ্রুতি নিয়ে সিএসডব্লিউপিডি (Community Social Work Practice and Development) ফাউন্ডেশন এবার আবারও একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্পন্ন করলো। ২৫ থেকে ২৭ মে WSWD2022: ৫ম আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি সিএসডব্লিউপিডি এবং পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হয় ঢাকায় ওয়াইডব্লিউসিএ-র মিলনায়তনে।

বিশ্বের ৩৭টি দেশের অধ্যাপক, গবেষক, সমাজকর্মী প্রমুখ এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ে তাদের গবেষণা-প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। মোট তিন দিনে ১০০-র বেশি প্রবন্ধ এতে উপস্থাপিত হয়। বিষয়সমূহ ছিলো: সামাজিক সহনশীলতা, টেকসই সামাজিক পরিবর্তন, প্রবীণ জীবনের সংকট, জীবনদক্ষতা, মানসিক সুস্থতা, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবন, সমাজকর্মের প্রতিবন্ধকতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ, মাদকাসক্তি ও পুনর্বাসন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, পরিবেশ সমস্যা, যত্ন ও পরিচর্যা, শিশুর যত্ন ও পিতামাতার দায়িত্ব পালন, লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

গত বছর আয়োজিত তাদের চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি ছিলো আরও বড় আকৃতির। যদিও করোনাভাইরাসজনিত অতিমারির কারণে ঐ সম্মেলনটি সম্পূর্ণই অনলাইনে করতে হয়েছিলো। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ৯৬ জনসহ মোট ১৫০ জন সমাজকর্মী ও গবেষক অনলাইনে তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন ও বক্তব্য রেখেছিলেন। এবারকার সম্মেলনে সরাসরি অংশগ্রহণ ও অনলাইনের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে সিএসডব্লিউপিডি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং

পিইউবি-র সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সমাজকর্মী মো. হাবিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় আমি এ সম্পর্কে তার ধ্যানধারণা জানতে পেরেছি। অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাম্যতাভিত্তিক, পরিবেশবান্ধব সমাজ-উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানব-প্রগতি নিশ্চিত করতে তিনি সমাজকর্মকে এ দেশে একটি আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত করতে চান। তৃণমূল মানুষের অংশগ্রহণে পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক উদ্যোগকে তিনি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেখে থাকেন। তার দৃষ্টিতে উন্নয়নের তত্ত্বকে ছাড়িয়ে মানুষ ও মানুষের যথার্থ মঙ্গলসাধনই সারকথা। সমাজকর্মকে বাংলাদেশে একটি আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত করার স্বপ্নে তাড়িত এই বিশিষ্ট সমাজকর্মী পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে বৈশ্বিক পরিস্থিতির আলোকে সামাজিক কার্যক্রমে নিজেকে অনেকদিন ধরে নিয়োজিত রেখেছেন।

২৭ মে বিকালের অধিবেশনে গবেষক শাহজাহান ভুঁইয়া ও আমার একটি উপস্থাপন ছিলো–ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা কার্যক্রম কতটা লিঙ্গসমতা-কেন্দ্রিক? (Financial inclusion services by NGO-MFIs—Is this focused on gender justice and equity?)–এই শিরোনামে। এতে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক জোহরা জান্নাত হাবিব। আমাদের প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোয় কর্মী হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম যদিও নারীর সামাজিক ভূমিকায় অগ্রগতি আনা তাদের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহ মূলত গ্রামের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র নারীদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাদেরকে ঋণসহায়তা দিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে ঋণপরিশোধ বাবদ অর্থ অর্থাৎ কিস্তি সংগ্রহ করে থাকেন বেশিরভাগক্ষেত্রেই ঋণদানকারী সংস্থাসমূহের পুরুষ কর্মীগণ। মাঠপর্যায়ের এই কাজে বড় কয়েকটি সংস্থা বাদে প্রায় কেউই নারী কর্মীদেরকে নিয়োগ দেয় না। এক্ষেত্রে অনেকরকম প্রতিবন্ধকতার কথা ভাবা হয়। ফলে এনজিওদের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম এখনো লিঙ্গসমতা অর্জন করতে পারেনি। প্রবন্ধে বলা হয়েছে, “অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম দাবি করছে সংস্থাসমূহে নারীকর্মী নিয়োগে জেন্ডার-সমতা ও ন্যায্যতা। যেহেতু এনজিওরা অনেকক্ষেত্রে অনুসরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, নারীকর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাদেরকে আরও মনোযোগী হতে হবে।”

প্রতি বছর সমাজকর্ম নিয়ে এরকম বিরাটাকৃতির আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন ছাড়াও সিএসডব্লিউপিডি নানা ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। প্রান্তিক শিশুদের জন্য শিক্ষা, মাদকবিরোধী সচেতনতা, তরুণ ও যুবসম্প্রদায়কে সমাজকর্মের জন্য গড়ে তোলা, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সচেতনতা তৈরি ইত্যাদিসহ বিভিন্ন সমাজকর্ম এ সংস্থাটি করে থাকে।

সমাজকর্মকে যাতে ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া মনে না হয় সেজন্য তারা তৃণমূলের মানুষের সঙ্গে সেবার চাহিদা ও ধরন নিয়ে মতবিনিময় করে থাকেন। এ সংস্থার উদ্যোগে ‘কমিউনিটি টকস নিউজলেটার’ নামে ইংরেজিতে একটি জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। যেখানে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অধ্যাপক, সমাজকর্মী ও গবেষকদের বিচিত্র বিষয়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধ

এছাড়া সমাজকর্মকে যাতে ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া মনে না হয় সেজন্য তারা তৃণমূলের মানুষের সঙ্গে সেবার চাহিদা ও ধরন নিয়ে মতবিনিময় করে থাকেন। এ সংস্থার উদ্যোগে ‘কমিউনিটি টকস নিউজলেটার’ নামে ইংরেজিতে একটি জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে। যেখানে থাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অধ্যাপক, সমাজকর্মী ও গবেষকদের বিচিত্র বিষয়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

সঠিক সময় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে বর্তমানের হাজারো সমস্যা ভবিষ্যতে আরও কঠিন হয়ে উঠবে ও সমাধানের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তদুপরি সামাজিক সমস্যাগুলো কারো একার পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা সমাজকর্মী প্রয়োজন। সমাজকর্মকে আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত করা সম্ভব না হলে এক্ষেত্রে আদর্শবাদী ও মেধাবী সমাজকর্মীর অভাব দেখা দিবে। সেজন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সিএসডব্লিউপিডি-র উদ্যোগে সমাজকর্ম নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেবাকার্যক্রম, নিউজলেটার ও জার্নাল প্রকাশ ইত্যাদিসহ নানাবিধ কার্যক্রম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

বর্তমান বিশ্ব যেভাবে ক্রমান্বয়ে জটিল রূপ ধারণ করছে ও মানুষ নতুন নতুন সামাজিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে তাতে বিভিন্নরকম সমাজকর্ম এখন কেবল জরুরিই নয়, এতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও আনতে হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সমাজকর্মকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন আলোয় দেখতে হবে। বাংলাদেশে সরকারের পক্ষ থেকে সমাজকর্মের ওপর আরও জোর দেয়া প্রয়োজন এবং সমাজকর্ম প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা দিয়ে এগিয়ে নেয়া প্রয়োজন। উন্নয়নের অতি জোয়ারে যাতে পরিবেশের ভারসাম্য, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সাম্যতা ভেসে না যায়, এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া জরুরি। আর উন্নয়নকে সত্যিকারভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হলে আজ অনেক অনেক নিবেদিত সমাজকর্মীর কোনো বিকল্প নাই।

আলমগীর খান

নিহত স্বামীর স্বপ্ন পূরণ করছেন
কাঁচির কারখানায় রওশন আরা

মনজুর শামস ও মো. শাহজাহান মিয়া

সিদীপের অনন্ত শাখায় খয়েরসুতী মাসিক সমিতির একজন সদস্য রওশন আরা। দক্ষ পরিচালনায় স্বামীর প্রতিষ্ঠিত কাঁচির কারখানাকে দিনদিন আরো লাভজনক করে তুলছেন। সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য দিনের আলোয় তার স্বামীকে হত্যা করার পরও দমে যাননি। পাবনা সদর উপজেলার দোগাছী ইউনিয়নের খয়েরসুতি গ্রামে রওশন আরার এই কাঁচির কারখানা এখন এলাকার উদ্যোক্তাদের জন্য এক অনুকরণীয় উদাহরণ। ভীষণ এক দুঃসময় উতরে তাকে এই সাফল্যের মুখ দেখতে হয়েছে।

৩০ বছর আগে ১৯৯২ সালের ১ মার্চ রওশন আরার স্বামী ইদ্রিস আলী এবং তার অন্য দুই ভাই একটি কামারশালায় কর্মকারের কাজ নেন। সেই কামারশালাতেই তারা কাঁচি তৈরি করতে শেখেন। কাঁচি তৈরি শেখার পর তিন ভাই মিলে শলাপরামর্শ করে ঠিক করেন–অন্যের কামারশালায় নয়, নিজেদের বাড়িতেই তারা কাঁচি তৈরি করবেন। এরপর কামারশালার চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই তিন ভাই মাত্র ১০ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে নিজেদের বাড়িতে কাঁচি তৈরি করে বিক্রি শুরু করেন। প্রাথমিক অবস্থায় তারা তাদের এই কাঁচির কারখানায় তিনজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলেন।

খুব ভালোই লাভ হচ্ছিল তাদের কাঁচির কারখানায়। ২০১২ সাল থেকে ইদ্রিস আলী ভাইদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে একাই এই ব্যবসা করতে থাকেন। কিন্তু হঠাৎ করেই ২০১৯ সালের ২৫ অক্টোবর জমিজমা নিয়ে বিবাদে একদল সন্ত্রাসী ইদ্রিস আলীকে প্রকাশ্য দিনের আলোতে কুপিয়ে হত্যা করে। বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো এ ঘটনায় রওশন আরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। গভীর অন্ধকার নেমে আসে সংসারে। থমকে যায় কাঁচির কারখানা।

তবে এই আঘাত কাটিয়ে উঠতে খুব একটা বেশি সময় লাগেনি রওশন আরার। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন সিদীপ নামে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা দরিদ্র পরিবারের লোকজনকে জীবনমান উন্ননের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঋণ দিয়ে

বড় ছেলের সঙ্গে রওশন আরা

থাকে। পানিতে পড়ে যেন খড়কুটো খুঁজে পেলেন! আর দেরি না করে তিনি সিদীপের অনন্ত শাখায় যোগাযোগ করেন এবং ঋণ নিয়ে স্বামীর ব্যবসার হাল ধরেন। ২০২০ সালের ১৮ অক্টোবর মাসিক কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে কাঁচির কারখানায় লাগান তিনি। নিজের ছেলেদের নিয়ে নতুন উদ্যমে কারখানার কাজ শুরু করেন। দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করে তারা আবারো লাভে ফেরান কারখানাটিকে।

এখন তার এই কারখানায় ১৫ জন শ্রমিক কাজ করে এবং মাসে তাদের পারিশ্রমিক দিতে হয় ২ লাখ টাকা। খরচ বাদে তার প্রতিমাসে লাভ হয় ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। রওশন আরা এখন তার কারখানায় ৬ ধরনের কাঁচি তৈরি করছেন। এগুলো হচ্ছে–১. ঢালাই কাঁচি, ২. মাইলস্টোন কাঁচি, ৩. পিতলের কাঁচি, ৪. লোহার কাঁচি, ৫. চুলকাটা কাঁচি এবং ৬. হেভি কাঁচি।

বর্তামানে তাদের মূলধন ১৫ লাখ টাকা। তারা তাদের কারখানার কাঁচি ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, খুলনা, পীরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, বোর্ডবাজার, টঙ্গি ও গাজীপুরে বাজারজাত করেন; এমনকি ভারতেও তারা কাঁচি রফতানি করেন। তাক লাগানো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন তিনি। এলাকায় তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোনো বাধাই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অদম্য ইচ্ছেশক্তি আর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সাফ্যলের দোরগোড়ায় পৌঁছা যায়–চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছেন রওশন আরা। বর্তমান তার বড় ছেলের বয়স ২৮ বছর এবং ছোট ছেলের বয়স ১৯ বছর। এখন তার ছেলেরাই ব্যবসায় হাল ধরেছে।

মনজুর শামস: গবষেণা ও ডকুমন্টেশেন কর্মকর্তা; মো. শাহজাহান মিয়া: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, অনন্ত ব্রাঞ্চ, পাবনা, সিদীপ

কাশিনাথপুরে বিডি এভারগ্রীনের উদ্যোগে

পাবনা পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতি ও উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার

আব্দুল জব্বার

পাবনার কাশিনাথপুরে বিডি এভারগ্রীন কর্তৃক 'পাবনা পূর্বাঞ্চলের অগ্রগতি ও উন্নয়ন: নাগরিক সমাজের ভাবনা' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় ৫ মে কাশিনাথপুর কলেজিয়েট স্কুলে।

বিডি এভারগ্রীনের উপদেষ্টা জনাব হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সিনিয়র সাংবাদিক ও বিএফইউজের কোষাধ্যক্ষ জনাব খায়রুজ্জামান কামাল।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, বিডি এভারগ্রীনের উপদেষ্টা ও 'আমাদের সমাচার' অনলাইন নিউজের সম্পাদক জনাব মাহবুব হোসেন।

বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট শেখ গোলাম হাফিজ, 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' সাময়িকীর সম্পাদক আলমগীর খান এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক আইসিডিডিআরবির সিনিয়র অফিসার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক কর্মকর্তা জনাব ছাইফুল ইসলাম শামীম। আরো উপস্থিত ছিলেন পাবনা সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক গল্পকার জনাব আকতার জামান, ভাষানটেক সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব আব্দুল্লাহ আল মোহন প্রমুখ।

সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় ছিলেন বিডি এভারগ্রীনের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আনোয়ার হোসেন খান শাহীন, ডা. তোফাজ্জল হোসেন তারা, মো. আরিফুল ইসলাম এবং প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক শেখ শাহীন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন দুলাই উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধান শিক্ষক গোলাম রসুল, কাশিনাথপুর ডিজিটাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আক্কাশ হোসেন, নাকালিয়া ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব মফিদুল ইসলাম শাহীন, ধোবাখোলা করোনেশন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ আবু বকর সিদ্দিক, শহীদ নুরুল হোসেন ডিগ্রি কলেজের শরীরচর্চা শিক্ষক জনাব জানে আলম, বাংলাদেশ রোটারি ক্লাব ঢাকা নর্থ-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বিডি এভারগ্রীনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য জনাব শহিদুল ইসলাম, কাশিনাথপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক জনাব শফিকুল আলম টিটুল খান এবং অন্যান্য।

আলোচকগণ বলেন, ভৌগোলিক অবস্থার দিক দিয়ে পাবনা পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ সাঁথিয়া, সুজানগর, বেড়া এ তিনটি উপজেলার কেন্দ্রস্থল কাশিনাথপুর। এ এলাকার মানুষ শিক্ষা, চিকিৎসাব্যবস্থাসহ নানাদিক দিয়ে অনেকটা এগিয়েছেন, তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে অনেক পিছনে। কাশিনাথপুর প্রশাসনিকভাবে অনেক পিছিয়ে, তাইতো শিক্ষা-চিকিৎসার পাশাপাশি প্রশাসনিক উন্নয়নেও জোর দিতে হবে। বিশেষ করে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম গড়তে সুশিক্ষা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন বক্তাগণ।

উল্লেখ্য, বিডি এভারগ্রীন বৃহত্তর কাশিনাথপুরে স্বেচ্ছা রক্তদানসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

লেখক: সাংবাদিক

এভারগ্রীন

মো. আনোয়ার হোসেন খান

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), সৈয়দপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পাবনা

নতুনের আগমনে বৈশাখ এলো রে–
গ্রীষ্মের দুপুরে রোদ্দুরে চারিদিক
গেল বুঝি গেল সব ঝলসে।
বৃষ্টির জলাধারার আগমনে
চাই শুধু এক ফোঁটা জল যে
বসন্ত বাতাসের সেই সুর বাজে প্রাণে
কবি কই, কবিতার বাতায়নে?
রাত্রির পূর্ণিমা সকালের বায়ু যেন
আকাশে বাতাসে রণে ঐ কাব্যিক সুরে সুরে
কোথায় যেন হারিয়ে যেতে চায় মন!
যেতে চায় মনপুরা ভাসানে।
জলে চরে পানকৌড়ি সাথে আছে শুশুকের নাচানাচি
আমি নাচি তারি সাথে কথা কই ঢেউয়ে ঢেউয়ে
নতুন বছর যেন পাতা ঝরা দিনের বদলে
নতুন পাতায় যায় ছেয়ে।
নতুন বছরে জরাজীর্ণতা ভুলে
হতে চাই এভারগ্রীন সকলে।

ভালোবাসাহীন কারুকাজ

মাহফুজ সালাম

দরদে উতলে ওঠে প্রাণ
আবার হিংসার লকলকে লেলিহান শিখা
ধর্মালয় থেকে কুঁড়েঘর ছাই হয়
বিদ্বেষের পাঁঠাবলি নছিমন, রজব আলী
নিরীহের প্রাণ যায় ধারালো দায়ের কোপে।

কাদায় কদাকার মুখ, ঢেকে রাখা ব্যভিচার
মহিষের পেট থেকে বেরিয়ে আসে মহিষাসুর
প্রজন্ম থেকে আজন্ম বিভক্ত মনের কাছে হারেনি দেশ
লক্ষ শহীদের রক্তে উড্ডিন লাল সবুজের পতাকা।

কালো মেঘের ভিতর আলোর লুকোচুরি
কাঁটার আস্তরণ অনেকটা পথ জুড়ে বিছানো ।
ঐ বুঝি সামনেই নিশ্চিন্তপুর।
জরা, মরা, মাড়িয়ে অনেক দূর যেতে হবে অপু।
যেতে হবে ঠিকানার শেষ প্রান্তে।

অত সুন্দর করে কার জন্য সেজেগুজে আছো
সে যদি চোখ মেলে নাইবা দেখলো তোমাকে
অমর প্রেমের কথা কতকাল হবে বলা
এখন প্রেমহীন প্রেম, ভালোবাসাহীন ভালোবাসায়
ছেয়ে গেছে ঘাসহীন হৃদয়, জন্ম নিচ্ছে নাম পরিচয়হীন প্রাণ
অশ্রুহীন অশ্রু, মায়াহীন মায়ার ফানুস উড়ে চলে নিরন্তর।

একরত্তি ভালাবাসা খুঁজেছি এ ঘর থেকে অন্য ঘরে
তলানিতে গিজগিজ করে এক শ্রেণির অবরুদ্ধ লোনাজল
এখনও ক্ষুধাহীন ক্ষুধা তাড়া করে ফেরে অঢেল উপাচার
বিবেকহীন বিবেকের কাছে আমৃত্যু পরে আছে ধন।

সিন্ডিকেট, কৃত্রিম সংকট, আনন্দহীন আনন্দ
বলগাহীন বিলাসিতায় উন্মাতাল লাগামহীন ঘোড়া
দিশাহীন জনরোষ পায়নি কোন পথ পরম
অতল তলের সে গুহাপথে
আমাকেও সাথে নিবে অপু?

যে মন ছুঁয়েছে আকাশ এখানেই তার শেষ নয়।
বহুদূর আরও বহুদূর যেতে হবে অপু।

বিশ্ব মহাসঙ্কটে

ডা. তোফাজ্জল হোসেন তারা

উদীয়মান মানুষের বিহঙ্গ পদচারণা
সাগর সৈকতে মানুষের উলঙ্গ বেহায়াপনা
দূষিত সে বাতাস মৃত স্তব্ধ প্রায়।
সমাজবদ্ধ মানুষগুলো হয়েছে আজ শূন্য
করোনায় মুহ্যমান মানুষ পৃথিবী জুড়ে তরঙ্গ।
শাসিত সমাজ শ্রমিক-মালিক ধনী-দরিদ্র
প্রেসিডেন্ট সবাই কারাজীবনের মতো অবরুদ্ধ।
কোথায় উড়োজাহাজ প্লেন রকেট ল্যান্সার মারণাস্ত্র সাবমেরিন
মাইক্রোস্কোপে অতিসূক্ষ্ম করোনা ভাইরাস তার কাছে পরাস্ত গোটা বিশ্ব।
হে সৃষ্টিকর্তা তুমিই জানো জাগতিক বিশ্ব আজ মহামারির কোন পর্যায়।
ধনী-দরিদ্র শত্রু মিত্র সবাই মৃত্যুভয়ে অবরুদ্ধ
বস্তি থেকে ধনীদের রাজকীয় বাসভবন সব থেমে গেছে।
কাউকে মানছে না এ ভাইরাস শ্রেণি বিচার করছে না
সাম্যবাদী চেতনা সবাইকে আঘাত করছে সমানভাবে
প্রভাবশালীদের জুয়া মদ ক্যাসিনো ইয়াবাসহ সব আস্তানা আজ বন্ধ।
প্রিয়জনের সান্নিধ্যে আসার স্পর্শ করমর্দন করার স্বাধীনতাও হারিয়েছে মানুষ।
কেউ চাইলেও ইউরোপ-আমেরিকা সিঙ্গাপুর কানাডা
বিলাসবহুল ভ্রমণ করতে পারবে না, সব বন্ধ
অঢেল টাকা থাকলেও অকেজো।
মানুষে মানুষে আত্মীয় মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব
সবই স্থবির হয়ে গেছে
এই সামান্য ভাইরাসের কাছে।

‘কৈশোর কর্মসূচি’ নিয়ে কিছু কথা

মোহাম্মদ মাহবুব উল আলম

ঘটনাক্রমে সিদীপের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্যারকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষের জন্য কাজ করার লোভে একজন উন্নয়ন কর্মী হওয়ার প্রত্যয়ে যোগ দিলাম উন্নয়ন সংস্থা সিদীপে–সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচিতে। ঢাকা শহরের ঝলমলে পরিবেশ থেকে সোজা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। আজ এই উপজেলায় তো কাল অন্য উপজেলার প্রত্যন্ত কোন গ্রামে। আমার মনের গহীনে তখন সমাজ গড়নের তীব্র আকাঙ্খা। প্রতিদিন কোন না কোন নতুন কর্মসূচি। দেয়ালপত্রিকা উৎসব দিয়ে প্রথম কর্মসূচি শুরু করি. ক্রমান্বয়ে নানাবিধ কর্মশালা (বিতর্ক, শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি, দেয়ালপত্রিকা ইত্যাদি বিষয়ক), সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, ইভটিজিং এবং নারী নির্যাতনবিরোধী র‌্যালি ও আলোচনাসভা, ধুমপান ও মাদকবিরোধী র‌্যালি, মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

২০১৯ সাল থেকে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বদলে হয়ে গেলো কৈশোর কর্মসূচি। কৈশোর কর্মসূচিতে “মেধা ও মননে সুন্দর আগামী” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে কার্যক্রম শুরু হয় যার লক্ষ্য: ১. নৈতিক মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা, ২. বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা, খাদ্য ও পুষ্টিসচেতনতা, ৩. নেতৃত্বের বিকাশ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং

কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে কাজ করেছি, চেষ্টা ছিল তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনার। সবাইকে হয়তো পারিনি। কিন্তু কেউ কেউ ঠিকই বদলে গেছে। প্রচণ্ড হতাশায় যে ছেলেটি মনেমনে বাড়ি থেকে পালানোর পরিকল্পনা করে ফেলেছিলো, আমার কথা শুনে সেই পরিকল্পনা বাতিল করে এবং আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে

৪. সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ামনস্ক করে গড়ে তোলা। এর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের সৎ গুণাবলী অর্জন, সত্যবাদিতা চর্চা, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সুসভ্য মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠায় উৎসাহিত করা হয়। এছাড়াও সকল অনৈতিক কাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখে উন্নত জীবনশৈলী তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা, সুস্বাস্থ্য অর্জন, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবোধ এবং প্রকৃতি ও দেশপ্রেম বিষয়ে সচেতন করা হয়।

কোন চাকরিই ২ বছরের বেশি করতে না পারা এই আমি কাজ করে ফেললাম প্রায় ৫ বছর, প্রতিদিন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন মুখ দারুণ উপভোগ করেছি। আগের চাকরিতে যেই আমি প্রায়ই হতাশায় ডুবে থাকতাম সেই আমার মনে কেবল সমাজের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তি। কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে কাজ করেছি, চেষ্টা ছিল তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনার। সবাইকে হয়তো পারিনি। কিন্তু কেউ কেউ ঠিকই বদলে গেছে। প্রচণ্ড হতাশায় যে ছেলেটি মনেমনে বাড়ি থেকে পালানোর পরিকল্পনা করে ফেলেছিলো, আমার কথা শুনে সেই পরিকল্পনা বাতিল করে এবং আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে, আবার যে ছেলেটি কোনদিনও পরীক্ষায় ২০ জনের মধ্যে আসতে পারেনি সে আমাদের কর্মসূচির সংস্পর্শে এসে পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং রোল নম্বর ১০এর ভিতর নিয়ে আসে, দিনে গড়ে ১০-১২ ঘন্টা মোবাইল গেমস খেলা ছেলেটি গেমস খেলার সময় ২-৩ ঘণ্টায় নামিয়ে আনে এবং মানুষের জন্য কিছু করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। সর্বোপরি বলা যায়, তাদের মনে ভালো মানুষ হওয়ার প্রত্যয় এসেছে।

লেখক: গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা

টংগিবাড়ীতে আয়োজিত শিশু মেলায়
সিদীপের প্রথম স্থান অর্জন

মো. আব্দুস সামাদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'শিশু ও নারী উন্নয়ন সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমে'র আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে টংগিবাড়ী উপজেলা চত্বরে "শিশু মেলা ২০২২" আয়োজিত হয় ২৩ ও ২৪ মে ২০২২। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মো. জগলুল হালদার (ভুতু)। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব রুমানা তানজিম অন্তর। দ্বিতীয় দিন সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুন্সীগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জনাব কামরুল ইসলাম খান। প্রধান আলোচক ছিলেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী জনাব মো. আজিম উদ্দীন, বিশেষ অতিথি ছিলেন টংগিবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোল্লা সোহেব আলী, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাহিদ খান ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব নাছিমা আক্তার।

মেলার অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল আলোচনা, শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বর্ণাঢ্য র‌্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু-শিক্ষক-অভিভাবক সমাবেশ, পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী। সিদীপের টঙ্গীবাড়ী ব্রাঞ্চ ছাড়াও মেলায় অংশগ্রহণ করে জেলা তথ্য অফিস, উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আশা, ব্যুরো বাংলাদেশ, ব্র্যাক, শক্তি ফাউন্ডেশন ও তিনটি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় (টংগীবাড়ী মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রংমেহের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পূর্ব সোনারং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়)।

সিদীপের স্টলটি ছিল সুসজ্জিত ও দৃষ্টিনন্দন। এতে বিশেষ আকর্ষণ ছিল প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শিত ঝরে পড়া রোধকল্পে সিদীপের শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি। যা প্রথম থেকেই মেলায় সকলের নজর কাড়ে। সিদীপের স্টলে ছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও বিনামূল্যে চক্ষুক্যাম্প। এখান থেকে সেবা গ্রহণ করে সকলেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। স্টলে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন ডা. এ কে এম আব্দুল কাইউম (ডিজিএম-স্বাস্থ্য)। চক্ষুক্যাম্পে সেবা প্রদান করেন সিদীপে কর্মরত উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার মো. সাহিন ও সাজিদুল ইসলাম।

এ মেলায় আকর্ষণীয় স্টলের জন্য সিদীপ ১ম স্থান অর্জন করে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় এ মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদীপের সম্মান আরো একধাপ এগিয়েছি বলে আমি মনে করি। এমন একটি পরিবেশে প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি উপস্থাপন করে শ্রেষ্ঠ হওয়ার সম্মান অর্জন করায় আমি নিজেও আনন্দিত এবং গর্বিত ।

লেখক: ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, ঢাকা জোন, সিদীপ

৪র্থ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন

১ এপ্রিল ২০২২ ছিল '৪র্থ শিক্ষালোক লেখক-শিল্পী সম্মিলন'। সিদীপ সেমিনার কক্ষে দিনব্যাপী আয়োজিত এ সম্মিলনে ছিল ৩টি আলোচনা: পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর আমিন উদ্দিন মৃধার উপস্থাপনায় 'একজন শিক্ষার্থী একটি খামার', কবি-গীতিকার ও শিক্ষক আলাউল হোসেনের উপস্থাপনায় 'পথপাঠাগার: পাঠাগার আন্দোলনের নতুন দিগন্ত' ও তরুণ বিজ্ঞানী আনোয়ারুল আজিম খান অঞ্জনের উপস্থাপনায় 'বায়োম্যাস ফুয়েল: উচ্ছিষ্ট বস্তু থেকে তৈরি জ্বালানি।'

শিক্ষালোকের সম্পাদক ফজলুল বারির সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনায় সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ শহিদুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারি, খ্যাতিমান সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক কুদরতে খোদা, লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ফাতিহুল কাদির সম্রাট, জনবিজ্ঞান সমায়িকীর সম্পাদক আইয়ুব হোসেনসহ অনেক লেখক ও শিল্পী। সিদীপের ভাইসচেয়ারম্যান লেখক-গবেষক শাহজাহান ভুঁইয়া, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য পুষ্টিবিদ ফাহমিদা করিম, সাধারণ পর্ষদের সদস্য লেখক-সম্পাদক সালেহা বেগমসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

এ ছাড়াও কৃষি খামার, পথপাঠাগার, বায়োম্যাস ফুয়েল, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন দশম শ্রেণির রসায়ন টেক্সট বইয়ের লেখক বিদ্যুৎ কুমার রায়, 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' সাময়িকীর নির্বাহী সম্পাদক নাজনীন সাথী, সাংবাদিক মঞ্জুলিকা জামালি, কবি অনার্য নাঈমসহ অনেকে। উপস্থিত ছিলেন লেখক ফয়সাল আহমেদ, শিল্পী বিজয় চন্দ, শিল্পী বিপ্লব দত্ত, চিত্রনির্মাতা শ্যামল দত্ত, শিল্পী অঞ্জনা সোম, লেখক-গবেষক মাহবুবুল ইসলাম, গবেষক ফাতিমা ইয়াসমিন, শিল্পী অশোক বিশ্বাস, লেখক তাপস বড়ুয়া, কবি রিয়াজ মাহমুদ, প্রকাশক জাহিদুল ইসলামসহ অনেকে।

অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন শিক্ষালোকের নির্বাহী সম্পাদক আলমগীর খান। সবশেষে কবিতা পাঠ করেন মিঠুন দেব ও গান গেয়ে শোনান ফাহমিদা করিম ও তাওহীদুন্নবী। অনেক লেখক-শিল্পীর উপস্থিতিতে দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই প্রাণবন্ত।

গ্রাম পর্যায়ে ‘মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার’ গঠন

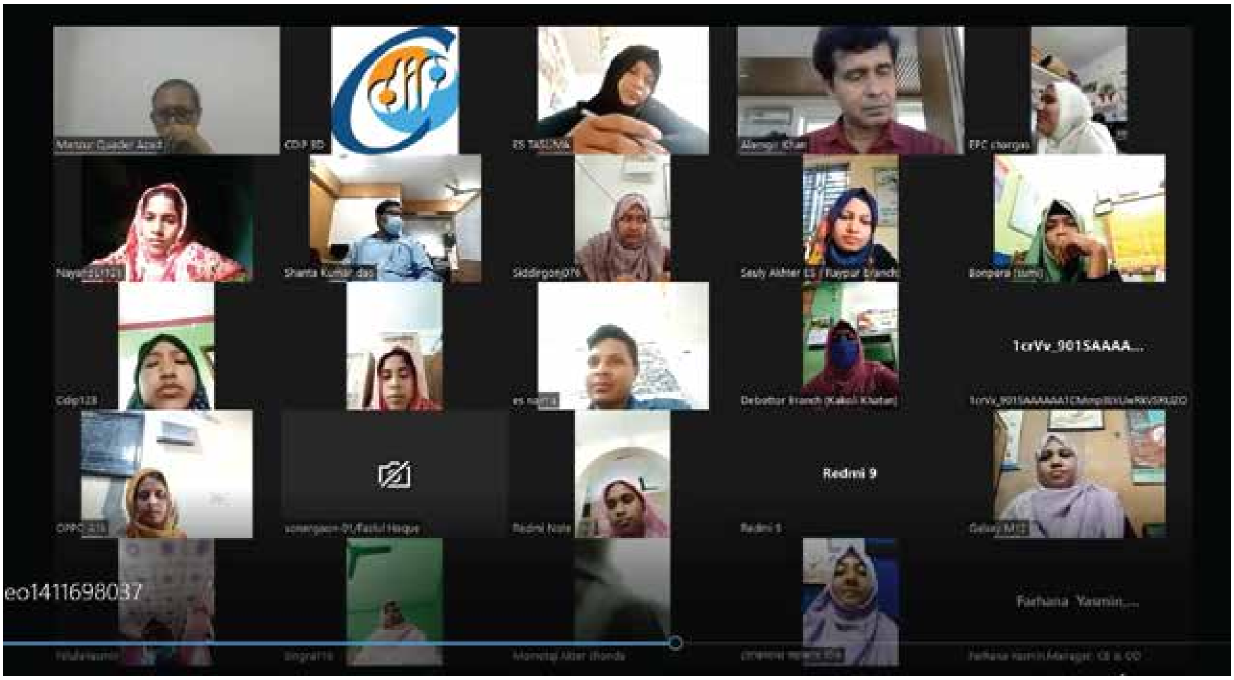

সিদীপ গ্রাম পর্যায়ে ‘মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্তপাঠাগার’ গঠনের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যা শুরু হয়েছে ব্রাঞ্চ পর্যায়ে বই সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। এ পর্যন্ত ২১টি ব্রাঞ্চে ভাল মানের অনেক বই সংগ্রহ হয়েছে, অন্যান্য ব্রাঞ্চেও এ কার্যক্রম চলছে। প্রাথমিকভাবে এ বইগুলো দিয়েই স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তপাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে। এ বইগুলো দিয়ে নিকটবর্তী কোনো ভাল স্কুল-কলেজের জন্য দেয়ালে ঝুলানোর মত প্রয়োজনীয় শেলফ তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। যে বইয়ের শেলফ থেকে যে কেউ ইচ্ছেমতো বই নিয়ে যাবেন ও পড়া শেষ হলে তা নিজ দায়িত্বে ফেরত দিয়ে যাবেন।

২৩ জুন ২০২২ সিদীপের কয়েকটি কর্ম-এলাকায় একটি করে মুক্তপাঠাগার গঠন সম্পর্কে ২১ জন শিক্ষাসুপারভাইজারের সঙ্গে অনলাইন (জুম) আলোচনা করা হয়। এরপর নাটোরে সিদীপের গোপালপুর-লালপুর ব্রাঞ্চে ও রাজশাহীর বাঘা ব্রাঞ্চে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুক্তপাঠাগার উদ্বোধনের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে।

গেপালপুর-লালপুর ব্রাঞ্চ, নাটোর

বাঘা ব্রাঞ্চ, রাজশাহী

আপন আলোয় রাঙানো ক্যানভাস
শিল্পের ডানায় ছড়ানো শিশির...

শিশির মল্লিক

বাংলাদেশের প্রতিথযশা তিন নারী চিত্রশিল্পীর বোধ ও জীবনদর্শনের আলোয় আলোকিত হতে চলেছে আমাদের শিল্পভূমি। সমৃদ্ধ হচ্ছে শিল্পের সম্ভার। যারা দেশে নয় আন্তর্জাতিকভাবেও সমাদৃত হতে চলেছে। তাদের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ আগামী দিনগুলো বিচিত্র বিষয় ভাবনা, আঙ্গিক ও নান্দনিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হবে এটাই জাতির প্রত্যাশা। আজ সেই বরেণ্য তিন শিল্পীকে নিয়ে আমাদের এই আয়োজন।

শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুর

'আমি সবসময়ই চেয়েছি আমার ছবি যেন সবার বোধগম্য হয়, সমাজের সব শ্রেণীর মানুষই যেন এতে কিছু না কিছু অর্থ খুঁজে পায়।,

'একটা বোধ আমার ভেতরে খুব গভীরভাবে কাজ করে। সেটা হলো, সবার মাঝে থেকেও আমরা প্রত্যেকেই খুব একা। আমার ছবিতে দেখবেন অনেক মানুষের প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু ওই অনেক মানুষের ভেতরেও আমি চেয়েছি প্রত্যেকটা মানুষের একাকীত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তুলতে। পরিবারে, পেশায়, সাংসারিক জীবনে আমাদের সব ধরনের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার পরেও, সব হাসি-আনন্দের ভেতরেও, কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা লুকিয়ে থাকে। সেই বিচ্ছিন্নতা ও বিষাদই আমার ছবির কেন্দ্রীয় বোধ।'

তাঁর ছবির বিষয়বস্তু সম্পর্কে নারীবাদের প্রসঙ্গ এলে তার জবাবে তিনি বলেন, 'আমি নিজে কখনো সচেতনভাবে নারীবাদের চর্চা করিনি। নারীবাদী অনুষঙ্গ আমার ছবিতে এসে থাকলে সেটা আমার সার্বিক

সমাজ-পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবেই এসেছে। আমি আগেই বলেছি, আমি সমাজের অসঙ্গতি ও বৈষম্যকে ছবিতে তুলে আনতে চাই। নারীর প্রতি বৈষম্যও এর একটা উদাহরণ। তবে, আমি মনে করি এভাবে নারী-পুরুষ আলাদা করে না ভেবে মানুষের মানবিক উৎকর্ষের মানদণ্ডেই সবকিছু বিচার করা দরকার।'

বর্তমান সময়ে মানুষ, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তার উপলদ্ধির কথা বলতে যেয়ে তিনি বলেন, ' বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সংকট হলো প্রেমহীনতা। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান হলো প্রেম। মানুষের সঙ্গে মানুষের শুধু নয়; পশু-পাখি, গাছ-পালাসহ পুরো জগৎটার প্রতি ভালবাসা ও একাত্মতার বোধই মানুষের সত্যিকার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আমাদেরকে, বিশেষ করে শিল্পীদেরকে, এই বিষয়টার প্রতি মনোযোগী হতে হবে।'

শিল্পী নাজলী লায়লা মনসুরের জন্ম ১৯৫১ সালে রাজশাহী শহরে। স্কুলজীবন চট্টগ্রামের ড. খাস্তগীর স্কুল। মেট্রিক পাশ করার পর বড় বোনের উৎসাহে ঢাকার চারুকলা ইনিস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন ১৯৯৮ সালে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ঝড়ে সাত আট মাস পর অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হন হলিক্রসে। পরে বিএ-তে ভর্তি হন ইডেন কলেজে। এখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেন। বরেণ্য শিল্পী ও সংগঠক রশিদ চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য বিভাগ চালু করলে সেখান থেকে ১৯৭৬ সালে মাস্টার্স করেন। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম চারুকলা কলেজ ও চট্টগ্রাম চারুকলা অনুষদে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে পেশাগত জীবনের অবসর নিলেও ছবি আঁকাআঁকির সাথেই তাঁর বসবাস। দেশে ও বিদেশে তাঁর একক চিত্রপ্রদর্শনী ও যৌথ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন বহুবার।

শিল্পী ফরিদা জামান

শিল্পী ফরিদা জামান বলেন, 'আমি খুব সাধারণ জীবনযাপনে বিশ্বাসী। এটাই আমার দর্শন। ছোটোবেলা থেকেই শখ ছিল শিল্পী

হবার। তাই গাছপালা, ফুল-পাখি টানতো ভীষণ। কল্পনার বাস্তব আবার বাস্তবের কল্পনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। ইচ্ছা জাগতো ভালোবাসার সেই অনুভব প্রকাশের। সেখান থেকেই ছবি আঁকার প্রতি আগ্রহ।'

খুব সহজ এবং সাবলীল তাঁর চিত্রভাষা। দেখা জগত তাঁর চিত্রভাষায় পেয়েছে নান্দনিক বৈশিষ্ট্য। রং ও আঙ্গিকে মুগ্ধতা সৃষ্টি করে, দৃষ্টিকে দেয় প্রশান্তি। ছবির মতো তাঁর বৈশিষ্ট্যও শান্ত ও সাধারণ। বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মামা হাশেম খানের মাধ্যমে তিনি রংতুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর রেখা বলিষ্ঠ, সাবলীল এবং ছন্দময়। আমাদের প্রতিদিনকার চেনাজানা পরিবেশ তার চিত্রে জায়গা নিয়েছে। যার মাধ্যমে দেশকে, দেশের মানুষ ও প্রাণ-প্রকৃতিকে অনুভব করা যায় খুব সহজেই। তাঁর কাজে যত্নশীলতা ও পারিপাট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

শিল্পী ড. ফরিদা জামান ১৯৫৩ সালে চাঁদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। চারুকলায় স্নাতক হন ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন ১৯৭৮ বরোদাতে অবস্থিত মহারাজা সাজিরাও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৯৫ সালে। অধ্যাপনা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে ড্রয়িং এন্ড পেইন্টিং বিভাগে। তিনি ২০২০ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। দেশে বিদেশে তার বহু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিল্পী রোকেয়া সুলতানা

'নারী খুব পাওয়ারফুল সত্তা। আমাকে নারীর পজিটিভ পাওয়ার প্রতিনিয়ত মুগ্ধ করে। আমার মাকে দেখেছি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে সংসার-সন্তানদের বড় করেছেন। নিজের জীবনের সৃজনশীলতা সবটাই আমাদের দিয়েছেন, হয়তো নিজে বিশিষ্ট হননি। কিন্তু এই যে স্যাক্রিফাইস সেটা কেন ছিল? সেটার অন্তরালে ওই পজিটিভ থিংকিংটাই প্রায়োরিটি পেয়েছে। তাই নারীরা কিন্তু সহজাতভাবেই সমৃদ্ধ, সৃষ্টিশীল এবং যোগ্য। নারী-পুরুষের বিভাজনের বিতর্ক নয়, মানুষ হিসেবে সবার সম্মান ও অধিকারের সমতার প্লাটফরমটা খুব জরুরি, যা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই ভারসাম্যের বিষয়, জীবনের এক অন্যতম নন্দিত দর্শন।'

চিত্রশিল্পী রোকেয়া সুলতানা, সৃজনে যিনি নন্দিত এবং প্রসংশিত। বাংলাদেশের শিল্পচর্চায় যার উজ্জ্বল উপস্থিতি। নারী শিল্পী ও পুরুষ শিল্পী এই বিভেদরেখা তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, 'শিল্পীসত্তার নারী-পুরুষ আমি বিশ্বাস করি না। শিল্পী শিল্পীই। যারা নারী নিয়ে কাজ করেন হয়তো সেই বিষয় দ্বারা তারা ইনফ্লুয়েন্সড! এটা হতেই পারে। এ বিষয়ভিত্তিকতার জন্যে শিল্পীসত্তার বিভেদীকরণটা আমি ঠিক মনে করি না; বরং এটা সম্পৃক্তকরণই স্বাভাবিক বলে মনে করি।'

তাঁর কাজের বিষয়, রঙ, রূপ ও কৌশল সম্পর্কে বলেন, 'ছবি আঁকাটা আমার কাছে ফ্লোইং রিভারের মতো, যেখানে গতি ও সময়ের ধারা আছে এবং অবশ্যই প্রতিদিনের ডায়রির মতো। প্রতিদিনের ডায়রির কথকতা আমার ক্যানভাসে সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে মনের অন্তর্যাত্রার প্রভাব এতে পড়বেই। তবে আমি অনেক ভাবি। ভেবেই কাজগুলো করি। একজন শিল্পীর জীবনযাত্রা, চেতনা, দর্শন, বোধের রিফ্লেকশন তার কাজে পড়ে। টেকনিক্যালি করণ-কৌশল জানার একটি পর্যায় আছে। কিন্তু উত্তরণের উৎসে দর্শন ও সেরিব্রাল গুরুত্বপূর্ণ। রঙ

আমাকে খুব প্রভাবিত করে। আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙের প্রতি অনুরক্ত হয়েছি, সেটাও ওই মনের প্রভাব। তাই শিল্প বিষয়টা কেবল দর্শনধারী নয়, এর ভেতর আছে অন্তর্নিহিত সমুদ্রের অতলতা, গভীর মগ্নতাতেই তা অনুধাবন সম্ভব।'

চিত্রশিল্পী রোকেয়া সুলতানার জন্ম চট্টগ্রামে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে। চারুকলা স্নাতক হন ১৯৮০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৮৩ সালে। তিনি ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ১৯৮৭ সালে। দীর্ঘ সময় ধরে ছাপচিত্র বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতায় আছেন। পাশাপাশি ছবি আঁকাকে সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বহু গ্রুপ ও একক প্রদর্শনী করেছেন দেশে ও বিদেশে। বহু পুরস্কারে ভূষিতও হয়েছেন। ১৯৯৯ সালে মর্যাদাপূর্ণ এশিয়ান বিয়েনাল পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন। সম্প্রতি ৬ জুন থেকে দিল্লী ললিতকলা একাডেমিতে 'রেট্রোস্পেক্টিভ রোকেয়া সুলতানা' শিরোণামে তাঁর একটি একক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। প্রদর্শনীটি ২৬ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলবে।

এই তিন শিল্পী আমাদের অহংকার। শিল্পের বিস্তৃত জায়গায় তাঁরা নিজ কর্ম ও সৃজন ভাবনায় স্ব স্ব অবস্থান করে নিয়েছেন যা আগামী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লেখক: চিত্রশিল্পী ও কবি

ড. বেনেডিক্ট গোমেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নের প্রাক্তন শিক্ষক
জন্ম: ২২শে মে ১৯৩৩, দেওতল্লা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা - মৃত্যু: ১৫ই মে ২০১০, ঢাকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক বেনেডিক্ট গোমেজ

আশরাফ আহমেদ

জীবিত থাকাকালে কাউকে ভালো বলা আমাদের স্বভাবে নেই। তাই মৃত্যুতেই মানুষকে মহান করে তুলতে সচেষ্ট হই। তাঁর জীবিতাবস্থায় যারাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, গোমেজ স্যারের মহত্ত্বের ছোঁয়া পেয়েছেন। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। রাখঢাক না করে তা প্রকাশ করতে আজ তাই কোনো সংকোচও নেই।

১৯৬৯ সনে তাঁকে প্রথম দেখি আমি প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকা অবস্থায়। ক্লাশের নতুন বিন্যাসে বা রুটিনে একজন শিক্ষকের নামের জায়গায় লেখা দেখলাম বিজি। অথচ এই নামের কাউকে চিনি না! লম্বায় বাঙালির মতো নন অথচ তামাটে-কালচে রঙের নির্ভুল বাঙালি। মেদহীন ঝরঝরে দেহ নিয়ে অপরিচিত ভঙ্গিতে মাটি থেকে অনেকটা ওপরে তুলে পা ফেলে ফেলে হেঁটে যান। লোকটির দিকে না তাকিয়ে পারা যায় না।

কিছুক্ষণ পরেই দেখি লম্বা পায়ে অতিশয় দ্রুত গতিতে আমাদের ক্লাশে ঢুকছেন। সময়ের অপচয় এবং স্বর উঁচু না করেই হাসিমুখে অথচ হুংকারের ভঙ্গিতে অভিবাদন জানালেন। আমরা ছাত্রছাত্রী খুশি হব না ভয় পাব বুঝতে না পেরে পরস্পরের দিকে তাকালাম। ইতোমধ্যেই নিজের নাম বললেন। সবার অবগতির জন্য নামটি বোর্ডেও লিখলেন–বেনেডিক্ট গোমেজ, সংক্ষেপে বিজি। এই স্টাইলটিও ছিল আমাদের জন্য নতুন। উপস্থিতির খাতা খুলে, ঘাড় তুলে লম্বাটে মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে, ইচ্ছা করেই কোনো কোনো অক্ষরে একটি য-ফলা যোগ করে যখন একেক জনের নাম ডাকা শুরু করলেন, আমরা আশ্বস্ত হলাম। তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পড়ানোর সময় তাঁর মুখের ও শরীরের ভাষায় (বডি ল্যাঙগুয়েজ) তাপহীন একপ্রকার প্রচণ্ড শক্তির বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পেলাম। তখনকার শক্তিবর্ধক সুপরিচিত একটি টনিকের নাম ছিল 'বিজি ফস'। এর সাথে স্যারের সামঞ্জস্য আমরা অচিরেই আবিষ্কার করলাম। শিক্ষক হয়েও ছাত্রদের যে সম্মান করতে হয়, এই প্রথম তাও জানতে পারলাম।

> একাকী বসে বসে এই মহৎ লোকটির উদ্দেশ্যে নীরবে প্রণাম জানিয়েছি। নিয়মিত না হলেও তাঁর সাথে পত্রে যোগাযোগ ছিল। বান্ধবহীন প্রবাস জীবন, জাপানি শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা জানিয়ে লিখতাম। তিনি ছিলেন আমিসহ অনেকেরই বিপরীতধর্মী; সদা হাসিমুখো তাঁকে কোনোদিন রাজা-উজির মারতে বা পরচর্চা করতে দেখিনি, কারো প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করতেও শুনিনি

তিনি আমাদের 'এনজাইম' পড়ানো শুরু করলেন, আর শেখালেন এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে অণুঘটক। ক্লাশেই শেখালেন যে এনজাইম আমিষ বা প্রোটিন দিয়ে তৈরি, আর প্রোটিন অ্যামাইনো এসিড দিয়ে তৈরি। অনেক জটিল সমীকরণ না বুঝলেও খুব তাড়াতাড়ি তাঁর মুখনিঃসৃত বর্ণনা থেকে আরো শিখলাম 'এনজাইম কাইনেটিকস', 'কেএম', এবং 'ভিম্যাক্স'। বই খুলে আমার আর কষ্ট করতে হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো চল্লিশ বছর ধরে সেই বিদ্যা ভাঙিয়ে আজও সেই 'কেএম' ও 'ভিম্যাক্স' নির্ণয় করে জীবিকা অর্জন করে চলেছি। তখনকার হওয়া সেই আগ্রহে আজও প্রোটিনের মাঝেই ডুবে আছি পেশা হিসাবে তা গ্রহণ করে। আমার জীবনে তাঁর অবদানের জন্য প্রতিদিন এক লাইনের একটি কৃতজ্ঞতা লিখে রাখলেও তা বেশি মনে হতো না!

আমার সাথে পঁচিশ বছর পর দেখা প্রাণরসায়নের এক সহপাঠী আমিরুল করিমের সাথে আরেক সহপাঠী শাহাবুদ্দিনের বাসায়। ওদের দেখা পঁয়ত্রিশ বছর পর। তখন নিজেদের স্বাস্থ্যের আলোচনায় বললাম, দিনশেষে কর্মক্ষমতায় ভাটা পড়ে বলে আমার উৎপাদনশীলতা বা প্রোডাক্টিভিটি আশানুরূপ নয়। কারণ সম্ভবত আমার দেহের গ্লাইকোজেন নামের সঞ্চিত শক্তি ধরে রাখার ক্ষমতা কম। আর তখনি মনে পড়ে গিয়েছিল অনার্স মৌখিক পরীক্ষায় গোমেজ স্যার জিজ্ঞেস করেছিলেন, গ্লাইকোজেন আর কোলাজেনের মাঝে পার্থক্য কী? বলতে আপত্তি নেই তাৎক্ষণিক উত্তর না দিতে পারায় ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

তা বুঝতে পেরে ঘর থেকে বের হয়ে অভয় দিয়ে বলেছিলেন 'এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করো না। গ্লাইকোজেন হচ্ছে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, শরীরের শক্তি জোয়গায়। আর কোলাজেন হচ্ছে একটি আমিষ বা প্রোটিন, যা শরীরের বিভিন্ন পেশীকে জোড়া লাগিয়ে রাখে। উত্তরটি যে তোমার জানা তাতে আমার সন্দেহ নেই'। সেদিন তাঁর এই চমৎকার সমমর্মিতায় মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ আগের ভয় ও অপমানের বোঝাটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। সেই ঘটনার স্মরণে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে পরবর্তীতে নিজের শিক্ষকতা জীবনে আমি আজ পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাশে গ্লাইকোজেন ও কোলাজেনের পার্থক্য শেখাই। আর আগাম জানিয়ে দেই যে এটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও সংযোজন করা থাকবে।

প্রথম বর্ষের ছাত্রাবস্থায় ফজলুল হক হলে চতুর্থ বর্ষের সালেহীন কাদরী ভাই থাকতেন আমার পাশের ঘরে। দিনরাত আমার হিন্দি-উর্দু-বাংলা পাঁচমেশালি গানের চিৎকারে অতিষ্ঠ হলেও গলাটি চিপে ধরতে পারতেন না মাঝে একটি দেয়াল ছিল বলে। তাই চিরতরে এই প্রতিভা বন্ধ করার জন্য তিনি বিভাগে একটি সাংস্কৃতিক সপ্তাহের আয়োজন করলেন। আর তাতে কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগে আমার নাম ঢুকিয়ে স্টেজে উঠতে বাধ্য করেছিলেন। গোমেজ স্যার যে একজন সঙ্গীতরসিক ছিলেন তখনই টের পেয়েছিলাম কারণ পেশাদার দুই সঙ্গীতজ্ঞের সাথে তিনিও একজন বিচারক ছিলেন।

কিছুদিন পর শংকরের 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' বইটি ঢাকার বাজারে এলে শীঘ্রই জানাজানি হয়ে যায় যে তিনি শুধু সঙ্গীতজ্ঞই নন, একজন খাঁটি বাঙালি সংস্কৃতির ধারকও বটে। নিজেদের আরো গর্বিত মনে হতো এই ভেবে যে শংকরের মতো উঁচুদরের লেখকের বইতে প্রশংসিত ব্যক্তি আমাদের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর এই প্রতিভার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম আরো কিছুদিন পর। প্রাণরসায়ন বিভাগের সামনের খোলা জায়গায় আমাদের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী উদযাপনে আরো তিন জন শিক্ষকের সাথে তিনিও গাইলেন 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো ...'। সংযুক্ত ছবিটিতে গোমেজ স্যারের মতো চৌধুরি স্যার, হারুন ভাই, এবং হারমোনিয়াম হাতে আমার অকৃত্রিম বন্ধু মাসুদ সিদ্দিকী বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আর আমি একা এটি আগলে বসে আছি। আমার পর এই ছবিটিরও আর বেঁচে থাকার প্রয়োজন হবে না।

স্বাধীনতার কয়েক মাস পরের কথা। আমি তখনো তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। কোনো কারণে সেদিন ছাত্রদের অনির্ধারিত ধর্মঘট থাকায় প্রাণরসায়নের তখনকার চেয়ারম্যান মতিউর রহমান স্যার (বহু বছর আগে বিগত হয়েছেন) বিল্ডিংটিতে ঢুকতে পারছিলেন না। আমাকে সামনে পেয়ে ভেতরে তাঁর ঘর

বড়দিনের উৎসবের কথা বলতে গিয়ে উৎসাহ নিয়ে শিখিয়েছিলেন গুড ফ্রাইডে কী, লাস্ট সাপার কী। হাত নেড়ে, শরীর ঝাঁকিয়ে বর্ণনা করেছিলেন ভ্যাটিকানের মন্দির থেকে সাদা ধোঁয়া বের হওয়ার সাথে পোপ নির্বাচনের সম্পর্ক কী। তাঁর গভীর ধর্মবিশ্বাস দেখে বারবার নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল

ইচ্ছা করেই কোনো কোনো অক্ষরে একটি য-ফলা যোগ করে যখন একেক জনের নাম ডাকা শুরু করলেন, আমরা আশ্বস্ত হলাম। তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পড়ানোর সময় তাঁর মুখের ও শরীরের ভাষায় (বডি ল্যাংগুয়েজ) তাপহীন একপ্রকার প্রচণ্ড শক্তির বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পেলাম। তখনকার শক্তিবর্ধক সুপরিচিত একটি টনিকের নাম ছিল 'বিজি ফস'। এর সাথে স্যারের সামঞ্জস্য আমরা অচিরেই আবিষ্কার করলাম। শিক্ষক হয়েও ছাত্রদের যে সম্মান করতে হয়, এই প্রথম তাও জানতে পারলাম

থেকে জরুরি কিছু নিয়ে আসতে বলে বিভাগের চাবিটি আমার হাতে দিলেন। আমার জন্য অপেক্ষা করতে চলে গেলেন শহীদুল্লাহ হলের হাউজ টিউটার গোমেজ স্যারের বাসায়।

ছাত্র হয়েও এই পুরো তিন তলা (বর্তমানের চতুর্থ তলাটি পরে সংযোজিত হয়) বিল্ডিংয়ের চাবি আমার হাতে! সেটি ছিল আমার জন্য অতি স্মরণীয় একটি দিন। প্রতিটি তলা, করিডোর ও ঘরের সামনে দিয়ে কয়েকবার করে হেঁটে গিয়েছি এক অজানা আনন্দ ও ক্ষমতার শিহরণ নিয়ে। অনেকক্ষণ পর কাজ শেষে শহীদুল্লাহ হলের বাসার দরজায় কড়া নাড়লাম। কাগজ ও চাবি হাতে দিয়ে চলে আসতে গেলে গোমেজ স্যার ভেতরে নিয়ে গেলেন। মতিউর রহমান স্যারের পাশে জোর করে, কাঁধে চেপে বসিয়ে নিজেও বসলেন আরেক পাশে। ভীষণ খুশি মনে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে পিরিচের ওপর বসানো হালকা সাদা রঙের ওপর কাজ করা একটি চায়ের কাপ আমার হাতে তুলে দিলেন। ছোটখাট দেহের আমি এক মূর্খ ছাত্র অনেক লম্বা, জ্ঞানী ও ক্ষমতাধর দুজন শিক্ষকের মাঝে চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে থেকে নিজেকে ভীষণ সৌভাগ্যবান মনে হয়েছিল। সেদিনের সেই অনুভূতি আমার আর দ্বিতীয়বার হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। চায়ের কাপটির কথা উল্লেখ করলাম কারণ এতো সুন্দর কাপ আগে আমি কখনো দেখিনি।

ছাত্রত্ব শেষ হতে খুব সহজেই তিনি আমাকে সহকর্মী হিসেবে গ্রহণ করলেন। বড়দিনের উৎসবের কথা বলতে গিয়ে উৎসাহ নিয়ে শিখিয়েছিলেন গুড ফ্রাইডে কী, লাস্ট সাপার কী। হাত নেড়ে, শরীর ঝাঁকিয়ে বর্ণনা করেছিলেন ভ্যাটিকানের মন্দির থেকে সাদা ধোঁয়া বের হওয়ার সাথে পোপ নির্বাচনের সম্পর্ক কী। তাঁর গভীর ধর্মবিশ্বাস দেখে বারবার নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল।

বছর কয়েক পর ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনেস্কোর জীবাণুবিদ্যা ক্লাশে নিজের বক্তৃতার ফাঁকে এক অধ্যাপক এগিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন 'তোমার বেনেদেক্তু গোমেজু সেন্সেয় এক ব্যক্তিগত চিঠিতে আমার এক বন্ধুকে তোমার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। বন্ধুর অনুরোধে সেই সুপারিশটি আমি সময়মতো ইউনেস্কো কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।' মনে পড়ে গিয়েছিল যে নিজে উদ্যোগী হয়ে তিনি সেই চিঠি লিখেছিলেন আমার উচ্চশিক্ষা-বৃত্তি নিশ্চিত করতে!

তখন স্বজন থেকে বহুদূরে, একাকী বসে বসে এই মহৎ লোকটির উদ্দেশ্যে নীরবে প্রণাম জানিয়েছি। নিয়মিত না হলেও তাঁর সাথে পত্রে যোগাযোগ ছিল। বান্ধবহীন প্রবাস জীবন, জাপানি শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা জানিয়ে লিখতাম। তিনি ছিলেন আমিসহ অনেকেরই বিপরীতধর্মী; সদা হাসিমুখো তাঁকে কোনোদিন রাজা-উজির মারতে বা পরচর্চা করতে দেখিনি, কারো প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করতেও শুনিনি।

আমার বিয়েতে বিভাগের সব শিক্ষকদের সাথে তিনিও এসেছিলেন আশীর্বাদ করতে। স্যারের সাথে শেষ দেখা হয়েছিল ১৯৯৪ সনে। প্রাণরসায়ন বিভাগে বসে গভীর আগ্রহ নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমেরিকায় আমার পেশার কথা, জীবনের কথা, পরিবারের কথা। এরই মাঝে কোনো এক সময় তাঁর মেয়ের, সম্ভবত কল্যাণীর বিয়ের কথা, এবং সে নিউইয়র্কে আসছে বলে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। এসেছিল কিনা আর জানি না। পরিচিতজনের কাছে স্যারের খোঁজ নেয়া ছাড়া ব্যস্ততায় আর যোগাযোগ রাখতে পারিনি। ১৫ তারিখ শনিবার অনুজ কয়জন প্রাণরসায়নবিদ জানালেন তাঁর অন্তিমযাত্রার কথা।

স্যার, আপনার জীবিতাবস্থায় যা পারিনি, আজ বিনত মস্তকে আপনার সেইসব গুণাবলীকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মেরিল্যান্ড, আমেরিকা
২২শে মে ২০১১

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বিজ্ঞানী ও লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক রম্য রচনা, সমাজ ও ভ্রমণ-নির্ভর বেশ ক'টি গল্পের বই ও উপন্যাস লিখেছেন।

ঈদ পুনর্মিলনী

সিদীপ প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষ, ১২ মে ২০২২

বনদেবী, শিল্পী রোকেয়া সুলতানা